সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : দেশ-কাল ও শিল্পরূপ

Issue cover not available

Vol. 12 | No. 2 | 1968

Check for updates

Volume	12
Issue	2
Year	1968
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Akram Hossain
Published online	December 16, 1968
DOI	10.62328/sp.v12i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v12i2.2
Pages	26-119
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ দেশ-কাল ও শিল্পরূপ

সৈয়দ আকরম হোসেন

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববরেণ্য কবি। অনেকাংশে এ কারণে তাঁর কাব্য মূল্য বিচারের প্রয়াস সমালোচক মহলে প্রথম থেকে লক্ষ্য করা যায় ; তাঁর কাব্যশিল্পকে কেন্দ্র করে শতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাটক এবং ছোটগল্প নিয়েও মোটামুটি আলোচনা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসশিল্প সম্পর্কে সমালোচকগণের অনীহা উল্লেখযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রউপন্যাসকে কেন্দ্র করে কোন সমালোচনা গ্রন্থ এপর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি ; এবং পশ্চিম বাংলায়ও এমন কোন গ্রন্থ নেই যেখানে রবীন্দ্রউপন্যাসের সামগ্রিক বিশ্লেষণ আমরা পেতি পারি। যাঁদের আলোচনা আমরা সচরাচর পেয়ে থাকি তাঁদের মধ্যে শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, সুবোধ সেনগুপ্ত, সুকুমার সেন এবং নীহার রঞ্জন রায় প্রধান। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন, সুতরাং উপন্যাস আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়েছে অনেকাংশে উক্ত গ্রন্থের সামগ্রিকতা সম্পাদনের প্রয়োজনে। এছাড়াও, তাঁদের আলোচনা দেশ-কাল এবং রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের সামগ্রিক প্রবণতানুসারে হয়নি। যদিও রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন ভাবে অনেক অন্তর্গূঢ় সারকথা তাঁরা বলেছেন। পরবর্তীকালের সমালোচকদের মধ্যে সরোজ বন্দোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য। তাঁর গ্রন্থও ইতিহাসমূলক রচনা, রবীন্দ্রউপন্যাস সেখানে অতিদ্রুত আলোচিত হয়েছে। ফলে তিনি নবতর দৃষ্টিভঙ্গির আরোপ করেছেন সত্য, তবে তা অসম্পূর্ণতাবোধে খণ্ডিত। রবীন্দ্রশিল্পদৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্থিতধী বোধ গড়ে তোলা যায় এমন কোন প্রয়াস সেখানে দুর্লক্ষ্য। পক্ষান্তরে বুদ্ধদেব বসুর স্ব-বিরোধিতা বিভ্রান্তিজনক। আমরা যথাস্থানে উক্ত সত্যগুলি নিয়ে প্রয়োজনানুসারী আলোচনা করেছি।

উপরোক্ত সত্যগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ দেশ-কাল ও শিল্পরূপ' নিবন্ধের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। আমাদের স্মরণ রাখতে হয়েছে যে সাহিত্য মনোজগতের সৃষ্টি হলেও মন শূন্যে নিরবলম্ব ভাবে ক্রিয়া করতে পারে না। সমাজপ্রবাহ স্রষ্টামানসকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজও দেশ-কালের অভিঘাতে স্রষ্টামানস গড়ে ওঠে। অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্য সঙ্গীত বাস্তবজগত অতিরেক কিছু হলেও, বস্তুজগত-হীন কিছু নয়। বলাবাহুল্য উপন্যাসের শিকড়, সাহিত্যের অন্য শাখা যেমন কবিতার তুলনায়, আন্তরিকভাবে সমাজজীবনের গভীরে প্রসারিত। কাব্য ভাবনার মানসিকতা এবং ঔপন্যাসিকের মানসিকতাকে সরলরেখায় সমন্বয় করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং রবীন্দ্রউপন্যাসের সুষ্ঠ আলোচনার প্রয়োজনে, রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের পুনর্বিচার করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

মূল বিষয়বস্তু চারিটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম অর্থাৎ **উপন্যাস বিচারের ভূমিকা** অংশে উপন্যাসের শিল্পগত গঠন-চাতুর্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছি ; যে বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মাত্রেরই সাধারণ গুণ। কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয় অপেক্ষা উপন্যাসশিল্পের লক্ষণগুলি বিচারের প্রয়াসী হয়েছি ।

দ্বিতীয়, **রবীন্দ্রমানসের উপাদান ও স্বরূপ** অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য, বাঙলার রেনেসাঁস, পারিবারিক পরিবেশ, সমকালীন দেশ-কাল, বিদেশী প্রভাব ও স্বদেশী সান্নিধ্য এবং ব্যক্তিগত অনুশীলন, পঠনপাঠন ও মনীষার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রশিল্পদৃষ্টি এবং ব্যক্তিত্বকে বিচার করে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছি। রবীন্দ্রনাথ কতটুকু ভাব-বাদী, কতটুকু মানবতাবাদী এবং উপনিষদের প্রবর্তনা কোন অর্থে যথার্থ আমরা বিচার করতে প্রয়াসী হয়েছি। যেখানে লক্ষ্য করেছি সমালোচকগণের সিদ্ধান্ত ও রবীন্দ্র-নাথের বক্তব্যের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সেখানে সমগ্র রবীন্দ্রমানসের সাক্ষ্য নিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি ; সে ক্ষেত্রে অনেক প্রচলিত গ্রন্থের সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন কোটিতে আমাদের সরে আসতে হয়েছে ।

তৃতীয়, **রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ দেশ-কাল** অধ্যায়ে দেশ-কালের ভাবসত্য ও প্রত্যক্ষ বাস্তবসত্য কি ভাবে রবীন্দ্রউপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। কাহিনী, পরিকল্পনা, চরিত্রসৃষ্টি, জীবনদর্শনে, চিত্রকল্পে দেশ-কালের প্রতিচ্ছায়ার স্বরূপ নির্দেশই এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য ।

চতুর্থ, **রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ শিল্পরূপ** অংশে রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র উপন্যাসের শিল্প লক্ষণ বিবেচিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, আমরা রবীন্দ্রনাথের করুণা উপন্যাসটিকে রবীন্দ্র-

শিল্পদৃষ্টির ক্রমপরিণতির ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছি। কারণ ঔপন্যাসিক প্রয়াস এবং উৎকর্ষ এক কথা নয়। প্রয়াসের মধ্যে গুহায়িত মানসিকতা লুক্কায়িত থাকে। রবীন্দ্র সমালোচকগণ করুণাকে বাদ দিয়ে রাজর্ষি থেকে বিচার করতে যেয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তে এসেছেন। আমারা যথাস্থানে এর উল্লেখ করেছি। এ অধ্যায়ে রবীন্দ্রউপন্যাসের গঠন কৌশল, ভাষারীতি, চরিত্র, প্রতীক এবং মানসিকতা সামগ্রিকরূপে বিবেচিত হয়েছে। কারণ আমাদের বিশ্বাস কোন স্রষ্টার জীবনদর্শনই সৃষ্টির প্যাটার্নকে আবিষ্কার করে। রবীন্দ্রমানসে প্রকৃতি-পরিবেশের উপস্থিতির গুরুত্ব যথাসম্ভব নির্দেশ করার চেষ্টা করেছি। প্রতিটি উপন্যাসের শিল্প স্বরূপ আলোচিত হয়েছে পৃথক ভাবে। তবে ক্রমবিকাশের সূত্রগুলি সচেতনভাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

উপসংহার অংশে রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টির এবং সৃষ্টিপ্রবাহের বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রকারে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি।

১. উপন্যাস-বিচারের ভূমিকা

১

যে কোন শিল্পরীতির জন্মসূত্র সমাজ জীবনের গভীরতর সত্যের সঙ্গে বিধৃত। সমাজসত্য স্রষ্টার মনোলোকে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তারই আন্তর গরজে তাকে সৃষ্টির প্রয়োজনানুগ রীতিকে আবিষ্কার করতে হয়। জীবনের যন্ত্রণা, গতি, সংঘর্ষ, উত্থান পতনের চলমান রেখার সঙ্গে সমন্বিত হয়েই বিশেষ কালের শিল্পরীতির জন্ম হয়। এই একই কার্যকারণে বাংলা সাহিত্যে কবিতার প্রাধান্য চর্যার কাল থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত; বিদেশী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও গদ্যের আবির্ভাব হয়েছে কবিতার রাজত্বের অনেককাল পরে।

গদ্যের আবির্ভাবের অন্তরালে সমাজবিন্যাসের, অর্থনৈতিক কাঠামোর এবং মনোজগতের বিরাট বিবর্তনের ইতিহাস জড়িত। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাবের সঙ্গে, বাংলার রেনেসাঁস উদ্ভূত নব জীবনবেদ, জীবনজিজ্ঞাসা, পরিবর্তিত অর্থনীতি ও সমাজবিন্যাস এবং রূপান্তরিত নবমূল্যবোধের প্রশ্ন জড়িত; এবং এই প্রেক্ষিতে ও সূত্রে বাংলা উপন্যাসের জন্ম। এসত্য সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, দেশী বিদেশী সব সাহিত্যের ক্ষেত্রেই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কাব্য সাহিত্যের তুলনায় উপন্যাস শিল্পই প্রভাবশালী ও অগ্রগামী। উপন্যাস শিল্পের এই আধিপত্য ও প্রসার নিঃসন্দেহে সমাজ সম্পর্কহীন নয়, শিল্প বিপ্লবোত্তর নাগরিক, যান্ত্রিক, কৃত্রিম, গতিবহুল বৈচিত্র্যমুখী জীবনের ছবি আঁকতে হলে এমন একটি শিল্পমাধ্যম প্রয়োজন যার মধ্যে সমাজ, দেশ-কাল ও মানুষের বাস্তব এবং ভাবসত্য প্রতিবিম্বিত হতে পারে। সেদিক দিয়ে উপন্যাস-শিল্প এমনি একটি শিল্প প্রয়াস যার মধ্যে ব্যক্তিজীবনের অন্তর্মুখিতা ও বৈচিত্র্য, সমাজজীবনের বিস্তৃত বাস্তব ও ভাবসত্য এবং দেশ-কাল-ইতিহাস ও সভ্যতার পারস্পরিক যোগাযোগ, দ্বন্দ্ব-মিলন, সংঘাত-সংঘর্ষ রূপায়িত হতে পারে।

২

উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ এবং এর মূলীভূত উপাদানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার শেষ নেই। এ-সম্পর্কে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমালোচকগণ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম প্রতর্কে উপস্থিত হয়েছেন, কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারেন নি। অবশ্য নির্দিষ্ট কোন শেষ সিদ্ধান্ত না দেয়াই বৈজ্ঞানিক এবং যথার্থ।

উপন্যাসের সংজ্ঞা এবং বিচারের পদ্ধতি বিশেষ কালে বিশেষরূপ গ্রহণ করে। আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের 'ওল্ডম্যান এ্যাণ্ড দি সী' কে যদি উপন্যাস বলা হয়, অপরপক্ষে সুবৃহৎ 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস' কে উপন্যাস বলা হয় কোন্ যুক্তিতে? একদিকে 'মবি ডিক্' 'সাইন অব ফোর' অপর পক্ষে 'ম্যাজিক মাউন্টেন' এবং 'ইউলিসিস' কে উপন্যাস হিসাবে গণ্য করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' দুটিই উপন্যাস। সুতরাং কোন সুস্পষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে উপন্যাসশিল্প রীতিকে গণ্ডিবদ্ধ করা যায় না। যায় না যে, এর কারণ বিশৃঙ্খল জীবনের সামগ্রিক সত্যকে বিচিত্র ভাবে অঙ্কন করার দায়ে পড়েই উপন্যাসশিল্পের উদ্ভব। পক্ষান্তরে কোন মহৎ ও শক্তিশালী স্রষ্টাই বিশেষ একটি ছক-কাটা রীতিকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। নবলব্ধ দৃষ্টিকোণের আন্তর গরজেই উপন্যাসের প্যাটার্ন, পদ্ধতির রূপান্তর ঘটে।

সুতরাং আমরা উপন্যাস শিল্পের কোন সংজ্ঞা নিরূপণের প্রয়াসী না হয়ে বরং এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশের চেষ্টা করব। 'কারণ আর্ট হিসাবে সাহিত্যের এই শাখাটি নানা বর্ণাঢ্য ঘনসন্নিবিষ্ট পুষ্পপর্ণে এমনই সমাছন্ন যে নিরাকার না হলেও চিত্র বা সঙ্গিত বা সনেটের মত সুমিত, সীমিত বা, সাকার নয়।' কাজেই উপন্যাসের আকৃতি বা প্রকৃতি নিয়ে গোঁড়ামি কেবল মূঢ়তার পরিচায়ক নয়, হাস্যকরও বটে। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সমালোচক বলেছেন ঃ

> Coming into existence to please an increasingly varied number of readers, novels, good novels too, can be of various kinds—a statement that only the narrowest and most intolerent critic of fiction would deny.[১]

প্রিষ্টলে অন্যত্র এই কথাটাই সুস্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

> The novel is a very loose, wide form : and the task of the novelist is to write as well as he can the kind of novel he wants to write.

উপন্যাসের এই স্বাধীনতাই তার শিল্পকর্মের দুরূহতাকে নির্দেশ করে। ঔপন্যাসিকের কাছ থেকে আমরা নিঃসন্দেহে জীবন, সমাজ ও সভ্যতার সামগ্রিক দ্বন্দ্ব, বৈচিত্র্য ও ক্রমবিকাশের রূপায়ণকেই প্রত্যাশা করি। কাজেই উপন্যাসের যথার্থ স্বরূপ বিচার করতে হলে আমরা কোন্ দিক দিয়ে অগ্রসর হবো? এ্যালেন ওয়াল্টার তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপন্যাস-বিচার প্রসঙ্গে আমাদের দ্রষ্টব্য কেবলমাত্র তার চরিত্রসৃজনী নৈপুণ্যই নয়, চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখকের পুরুষার্থ এবং জীবনবোধ মূল্যবোধ কতটুকু কোন্ স্বরূপে প্রকাশিত তাও বিচার্য।[২]

উপন্যাসের মধ্যে আমরা কয়েকটি উপাদান লক্ষ্য করতে পারি। তারমধ্যে মূলতঃ, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। ক. ঔপন্যাসিকের জীবন দর্শন (author's view of Life) খ. গল্পাংশ, চরিত্র পরিবেশ, সংলাপ এবং ভাষা-অলংকার। সমালোচকগণ তাঁদের দৃষ্টিভংগী অনুসারে উক্ত উপাদানগুলির কয়েকটিকে উপন্যাসশিল্প সৃষ্টির প্রশ্নে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কেউ গল্পাংশকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করেন।

> ...The novel tells a story. That is the fundamental aspect without which it could not exist. That is the highest factor common to all novels. ... It runs like a back bone.[৩]

কিন্তু একথা সত্য যে কেবলমাত্র story telling aspect-ই উপন্যাস শিল্পের মূল কথা নয়। আমরা উপন্যাসের মধ্যে অন্য বৃহত্তর সত্যকে উপলব্ধি করতে চাই। প্রিসটলের মতে : মহৎ উপন্যাস যিনি রচনা করবেন তাঁর প্রথম ও প্রধান গুণ চরিত্র চিত্রণ সামর্থ্য। এমন চরিত্র তিনি সৃষ্টি করবেন যা পাঠকের সমগ্র সত্তাকে একেবারে আবিষ্ট, মন্ত্রমুগ্ধ, আত্ম-বিস্মৃত করে দেবে, নানা গুণান্বিত, প্রশংসার্হ বা শ্রদ্ধার্হ বলে নয়, এর মূলে হল, সতেজ, সরস, প্রাণবত্তা যাকে শ্রদ্ধা না করলেও বিশ্বাস না করে, সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে নিবিড়ভাবে, অব্যবহিতভাবে অনুভব না করে উপায় নেই।

> For what is essential is that the novelist, what else he does, should be able to show us people who by some means or other, through delighted fascination, repulsion, or mere conviction that in their own world they exist, catch and hold our imagination. If his characters fail to do this, then the novelist has failed.[৪]

অন্যকোন গুণ তাঁর যদি নাও থাকে, যথার্থ ঔপান্যাসিক, আর অন্য সহস্র গুণ থাকলেও এই দুর্লভ ক্ষমতাটি যদি না থাকে, তিনি আর যাই হোন উপন্যাস রচয়িতা নন।

আমাদের মতে কেবলমাত্র গল্পাংশ, চরিত্র-স্বজনী ক্ষমতাই উপন্যাসের কোন সার্বিক রূপ নয়। উপন্যাসের মধ্যে আমরা জীবনসংক্রান্ত পরিচ্ছন্ন একটি বোধ প্রত্যাশা করি। যে দৃষ্টিকোণ দিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর বিষয়কে নির্বাচন করেন, সেই দৃষ্টিকোণের মধ্যদিয়েই স্রষ্টার ব্যক্তি-মনের প্রকাশ ঘটে থাকে। এ কথাটাই এ্যালেন ওয়াল্টার বিস্তৃত ভাবে বলেছেন।

> The novelist is free to chose his material only in a limited sense, and his choice is governed by the deepest compulsions of his personality. It is these that dictate both the nature of his novels and the conclusions about life he expresses through them ... every novel is an extended metaphor of the author's view of life—on life itself.[৫]

কোন উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি, চরিত্র-চিত্রণ-ক্ষমতা এবং ঘটনা বিন্যাস পদ্ধতি বিচ্ছিন্ন ভাবে রূপায়িত হতে পারে না। ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্যই জীবন স্বষ্টি করা। এই জীবন-স্বষ্টি-প্রয়াসের মানসিক প্রবণতা অনুসারেই ঘটনা, চরিত্র স্বষ্টি হয়। সুতরাং সমাজ-সত্য ঔপান্যাসিকের নিকট raw materials হিসাবেই গৃহীত হয়। মালার আকারে পুষ্প সন্নিবিষ্ট করলেই মালা হয় না, এমন কিছু দরকার যা অদৃশ্যভাবে তাদেরকে সংগ্রথিত করে রাখে, সেই হোল মালার আত্মিক শক্তি। তেমনি গল্পাংশ, চরিত্র, বর্ণনা, সংলাপ ইত্যাদি উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও, বিচ্ছিন্নভাবে তাদের কোন গুরুত্ব নেই, যতক্ষণ না তা কোন ব্যক্তিত্ব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে কেবল মাত্র, জীবনদৃষ্টি দিয়েও উপন্যাস স্বষ্টি হতে পারে না। বস্তুত, লেখকের পুরুষার্থ, জীবনদর্শন উপন্যাসের গঠন-শৈলী অর্থাৎ গল্পাংশ, চরিত্র, বর্ণনা, সংলাপ, পরিবেশ ইত্যাদির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, একটি থেকে আর একটি পৃথকীকরণ সম্ভবপর নয়। পার্সি লুবক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে এসম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ[৬]

> The well-made book is the book in which the subject and the form coincide and are indistinguishable—the book in which the matter is all used up in the form, in which the

form expresses all the matter where there is disagreement and conflict between the two, there is stuff that is superfluous or there is stuff that is wanting ; the form of the book, as it stands before us, has failed to do justice to the idea.

৩

স্রষ্টার জীবন সম্পর্কে দেখার মানসিক রূপই অখণ্ড উপন্যাসের মধ্যে প্রবাহিত। সুতরাং কোন উপন্যাসের স্বরূপ বা প্যাটার্ন' নির্ভরশীল স্রষ্টার জীবন-দর্শনের উপর। আমাদের বিচার্য বিষয় হোল লেখকের যে কোন উদ্দিষ্ট প্রয়াস সমগ্রতাবোধে অখণ্ডিত কিনা, চরিত্র বিকাশে কার্যকারণ-সূত্র আগাগোড়া প্রয়োগ-সূত্র অনুসারে রক্ষিত হয়েছে কিনা, সর্বোপরি জীবন সৃষ্টি হয়েছে কিনা, যা আমাদেরকে বাস্তবানুগ সত্য-বিশ্বাসে আন্দোলিত করতে পারে।

ঔপন্যাসিকের বিষয়-নির্বাচনের ক্ষেত্র সমগ্র মনুষ্য সমাজ। উপন্যাসের বিষয় বস্তু বলতে আমরা ব্যক্তি ও সভ্যতার পারম্পরিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বুঝি।

His field is virtually the whole range of human activity. Aspiration, failure, achievement, the gamut of the passions, the form and feature of contemporary life, **the complexity of individual problems** – out of all this confused welter of experience the novelist must create his harmony.[৭]

ব্যক্তি-জীবনের সমস্যার জটিলতাই উপন্যাসের ক্ষেত্রে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। ব্যক্তি-জীবনের সমস্যা নানা মুখিন — এই বিচিত্র জীবন সমস্যার সমগ্রতার সন্ধানই ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। এই সমগ্রতার সন্ধানী-দৃষ্টির মধ্যেই ঔপন্যাসিকের বক্তব্য বিষয় নিহিত থাকে। ব্যক্তি অর্থাৎ জীবনের যন্ত্রণা, সংঘাত, সমস্যা, বিকৃতি, প্রশান্তি ইত্যাদি নির্ভরশীল সমাজ-সভ্যতা ও রাষ্ট্রিক অবস্থার উপর। ঔপন্যাসিক তাই ব্যক্তি সমস্যাকে বিশ্লেষণ করেন উপন্যাসের অন্যান্য ব্যক্তি এবং সমাজ-সভ্যতা রাষ্ট্রের পটভূমিতে বিন্যস্ত করে। এই সামগ্রিক পটে দেখার দৃষ্টিই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি।[৮] ঔপন্যাসিকের জীবন-বোধ গড়ে ওঠে তার সময়জ্ঞান, ইতিহাসজ্ঞান এবং ব্যক্তি মানসের জ্ঞান ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে। লেখকের এই সামগ্রিক জ্ঞানই জীবন দর্শন (attitude towards life.) রূপে উপন্যাসের প্রতিটি অংশে প্রতিফলিত হয়।

আমাদের উপন্যাস বিচারের ক্ষেত্রে বোঝা দরকার কিভাবে, কোনপদ্ধতিতে স্রষ্টা তাঁর মানসরূপকে রূপায়িত করেন। শিল্পসৃষ্টির কৌশল যদিও ব্যাখ্যার অতীত একদিক দিয়ে, তবুও স্থূলভাবে তার দিক নির্দেশ করা দরকার। লেখক তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাস্তবকে অঙ্কন করেন সত্য, তবে সে যথাযথ বাস্তবজগৎ নয়। তা সাহিত্যের বাস্তব, লেখকের মানস লোকের বাস্তব; পাশ্চাত্য সমালোচক থেকে প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকগণও এ সম্পর্কে একমত। পার্শি লুবক তাঁর গ্রন্থে জীবন-সৃষ্টি-পদ্ধতিকে (যা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে রূপায়িত হয়) নানা ভাবে শ্রেণীকরণ করেছেন— চিত্রানুগ বর্ণনা (Pictorial treatment) দৃশ্যানুগ বর্ণনা (Scenic treatment) নাট্যানুগ বর্ণনা (dramatic treatment)। তবে পদ্ধতির শ্রেণীকরণ সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত কথা ঃ

> Here we have, then, the elements of the novelists method essentially few and simple, but infinite in their possibilities of fusion and combination. They are arranged in a new design to suit every new theme that a writer takes in hand; we see them alternated, united, imposed one on another, this point of view blended with that, dramatic action treated pictorially, pictorial description rendered dramatically ... In well-fashioned work it is always interesting to discover how method tends to be laid upon method, so that we get, as it were, layers and stratifications in the treatment of a story.[৯]

কিন্তু ঔপন্যাসিক তাঁর সৃষ্টি-কর্মে কোন্ ধরণের পদ্ধতি আরোপ করবেন, তা বহুলাংশেই নির্ভরশীল ঔপন্যাসিকের জীবন-দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের উপর। ঔপন্যাসিকের বাসনালোক, মানসিক প্রবণতা, কল্প-লোকের রুচি ও বৃত্তির উপর ভিত্তি করেই তা উৎসারিত হয়। ফ্লবেয়ার ও টলষ্টয়-এর জীবন-দৃষ্টির ভিন্নতার জন্যেই 'মাদাম বোভারী' এবং 'আনাকারানিনা'র পদ্ধতি ভিন্নতর। সমকালীন হওয়া সত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাস-রীতি ভিন্ন। মানব জীবনের অতুল্য আবেগধর্মী মুহূর্ত বঙ্কিমের শিল্পী-মানসকে আলোড়িত করে বলেই বঙ্কিমী-রীতি অনেকাংশে নাটকীয়; পক্ষান্তরে গ্রামীণ জীবনের মন্থর-গতি-বৈচিত্র্য তাঁকে আকর্ষণ করে বলেই রমেশচন্দ্র দত্ত বহুলাংশে চিত্রাত্মক। সুতরাং একথা অত্যুক্তি নয় যে, জীবন-সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণের বৈচিত্র্যের

সঙ্গে সমান্তরাল ভাবেই উপন্যাস-বিন্যাস-পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। প্রতিটি মহৎ জীবন-বোধের জন্যেই নব-আঙ্গিকের আবিষ্কার করতে হয়। কারণ বিষয় ও ফর্ম বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, জীবনচেতনা, শিল্পদৃষ্টির সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশই উপন্যাসের ফর্ম।[১০]

প্রকৃতি ও পরিবেশের একটি সবিশেষ ভূমিকা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রয়েছে। কারণ কোন ব্যক্তি কেবল অপরাপর ব্যক্তি, দেশ-কাল-সভ্যতার পটভূমিতে বিকশিত হয় না। পরিবেশ ও প্রকৃতির পটভূমিতেও সে বিকশিত হয়। মানুষ যেমন পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে, পরিবেশও তেমনি মানব চরিত্রকে প্রভাবিত করে। **H. B. Lathrop** তাঁর গ্রন্থে কাহিনী, প্লট ও চরিত্রের পরই পরিবেশকে উপন্যাসশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে ঃ

> When their people act, they act to manifest themselves, to exhibit their oddity or special difference ; and the setting is important because it is the soil or medium in which peculiar types of human nature flourish.[১১]

কোন স্রষ্টার চরিত্রগুলি মানোসলোকে নিরবলম্ব ভাবে অবস্থান করে না, উপন্যাসে প্রকাশিত হবার আগেই ঔপন্যাসিকের কল্পলোকে রূপ লাভ করে — সুতরাং পরিবেশের গুরুত্ব স্রষ্টার মানস প্রবণতার মধ্যেই বিধৃত হয়ে থাকে। এ কারণেই পরিবেশ ভিন্ন-স্রষ্টার উপন্যাসে ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ডিকেন্‌স-এর কাছে প্রকৃতি পরিবেশ একমূল্য পেয়েছে, পক্ষান্তরে টমাস হার্ডি এবং মেরেডিথের কাছে পেয়েছে ভিন্ন প্রবর্তনা। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি-পরিবেশ প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত ভিন্নতর সত্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। আমরা জানি, মহৎ উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনা, ইঙ্গিত এবং বাক্য ও শব্দ পর্যন্ত লেখকের উদ্দিষ্ট রস সৃষ্টির অনুপন্থী হয়ে প্রকাশিত হয়। এ সব কিছু মিলিয়েই উপন্যাস আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে আবেদন আনে। উপন্যাস বিচারের প্রশ্নে প্রতিটি উপদানকে বিশ্লেষণ করতে হবে একটি লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে — সামগ্রিক সৃষ্টির রসাবেদনের প্রয়োজনে তা কতটুকু সার্থক। যদি কোন ঘটনা, ইঙ্গিত এবং পরিবেশধৃত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ কার্যকারণসূত্রে আমাদের বিশ্বাসকে সন্তুষ্ট করতে না পারে, লেখকের বক্তব্যের ক্রমবিকাশকে খণ্ডিত করে, অখণ্ডতার হানি করে তবে উপন্যাস সৃষ্টির কৌশল হিসাবে তাকে রসোত্তীর্ণ বলা যেতে পারে না। উপন্যাসের প্রতিটি উপাদান কোন বিশেষ উপন্যাসের সামগ্রিক-ঐক্যসূত্রে বিধৃত হয়ে তার রস পরিণতি লাভ করবে এসত্য কেবল উপন্যাসই নয় মহৎ সাহিত্য ও আর্ট মাত্রেরই সাধারণ গুণ।

৪

আশা করি একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, উপন্যাসের ঘটনা, প্লট, বর্ণনা, চরিত্র, প্রকৃতি পরিবেশ, ভাষা এবং সংলাপ, সর্বোপরি উপন্যাসের প্যাটার্ন' ঔপান্যসিকের জীবন দৃষ্টির ও বাসনা-লোকের শৈল্পিক প্রতিফলন। চরিত্র স্থষ্টির দৃষ্টি-কোন্, বর্ণনা পদ্ধতির নির্বাচন ইত্যাদি স্রষ্টার পুরুষার্থ ও বক্তব্যবিষয় দ্বারা মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত। কাজেই উপন্যাস বিচারের পূর্বশর্ত হল ঔপন্যাসিকের স্থষ্টি মানসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। স্রষ্টা মানসের গুহায়িত সত্যগুলি যদি আমাদের কছে পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে—যে কোন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস স্থষ্টিকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, কোন্ ঐক্য-সূত্রে তাঁর স্থষ্টি চরিত্রগুলি উজ্জীবিত হচ্ছে, ক্রমপরিণতির দিকে অগ্রসারিত হচ্ছে, বিষয় নির্বাচিত হচ্ছে, সংলাপ ভাষা অলংকারের ব্যঞ্জনা স্থষ্টি হচ্ছে, আমরা অবলোকন করতে পারি।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুবিশাল জীবন ব্যাপী স্থষ্ট সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে হলে — তাঁর স্থষ্টি-মানসকে উপলব্ধি করতে হবে সম্যক ভাবে। এই দিক লক্ষ্য করেই আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে রবীন্দ্রমানসকে যথাসম্ভব বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করে, তার স্বরূপ নির্দেশের চেষ্টা করেছি; এবং সেই সূত্রেই রবীন্দ্রউপন্যাসের শিল্প-মূল্য বিবেচিত হবে।।

২. রবীন্দ্রমানসের উপাদান ও স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-ক্ষম-প্রজ্ঞা সুদীর্ঘ কালের বহুমুখী জটিলতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের কাল—বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের উত্থান, উৎকর্ষ এবং অবক্ষয়—এই দুই বিশিষ্ট যুগের মধ্যে সম্প্রসারিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্টদশকের প্রথম পাদে—তাঁর জন্মকালে বাঙ্গালী সমাজ থেকে সামন্তজীবনবিন্যাস একেবারে বিলুপ্ত হয়নি ; মধ্যবিত্ত শ্রেণী সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছে ; ধনবাদী সমাজের পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ জাতীয় মূলধন সংগ্রহের কাজ চলছে। পক্ষান্তরে মৃত্যুকালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধনবাদী সমাজের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার বর্বরতা পৃথিবীর মানবতাকে আক্রান্ত করেছে। জাতীয় ক্ষেত্রে—কংগ্রেস সকল অঞ্চলে শাসনক্ষমতা হারিয়ে আবার দেশ মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছে। লাহোরে লীগের বাৎসরিক সম্মেলনে জিন্নাহ্ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন : No Power on earth can prevent Pakistan[১].

ফলত, রেনেসাঁস-উত্তর বাঙ্গালী জাগরণের সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণ কাল অর্থাৎ পরাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের নানা জটিল পরিবেশ, সামাজিক বিচিত্র আবর্তনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি-প্রতিভা গড়ে উঠেছে, আন্দোলিত হয়েছে, পরিবর্তিত হয়েছে। তবে সে পরিবর্তন আকস্মিক নয়, অসম্পৃক্ত নয়, বরং মূল একক জীবনার্থের অনুপন্থী মাত্র। কাজেই তাঁর সুবিশাল ব্যপ্ত — জীবনের ক্রমভঙ্গ রূপকে সঠিক মূল্য-সত্যে চিহ্নিত করতে না পারলে উপন্যাস বিচারও খণ্ডিত হতে বাধ্য।

যে কোন মহৎ স্রষ্টার মতই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-ক্ষম-প্রজ্ঞা তাঁর জীবনদর্শন, বোধ ও বোধি, রাষ্ট্রনীতিক, সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক মতাদর্শের সমবায়ে গঠিত। এবং উক্ত মতাদর্শগুলি বাঙ্গালী সমালোচক মহলে বহু আলোচিত ও তর্কিত বিষয়, এ কারণে তাঁর মতাদর্শের স্বরূপ আবিষ্কার যতটুকু না সহজ হয়েছে, তার চেয়েও অনেকাংশে হয়েছে বিভ্রান্তিকর। কারণ হিসাবে বলা চলে, অধিকাংশ সমালোচক

তাঁদের পূর্বনির্ধারিত ও গৃহীত ব্যক্তিচিন্তাকে রবীন্দ্রমানসে প্রত্যাশা করেছেন, না পেয়ে স্বীয় চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোন পক্ষ একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক (প্রচলিত অর্থে) ব্যাখ্যা দেবার জন্যে বারবার উপনিষদের শ্লোকের দ্বারস্থ হয়েছেন, পক্ষান্তরে কেউ মার্কসীয় দৃষ্টিতে রবীন্দ্রজীবনদৃষ্টি বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন।[২] ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রবন্ধে মার্জিত হাস্যরসের মধ্য দিয়ে উক্ত বিভ্রান্ত মানসের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন।[৩]

১

রবীন্দ্রমানসের পুনর্বিচারের মধ্যদিয়ে একটি সম্ভাব্য স্বরূপ ব্যাখ্যার পূর্বে আমরা বিভ্রান্তিজনক কয়েকটি সমালোচকীয় উক্তি এবং পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের বক্তব ও অন্য সমালোচকের বক্তব্য উদ্ধৃত করব। আশা করি তাহলে আমাদের বক্তব্য বিষয়টি বহুলাংশে সুপরিস্ফুট হবে।

> ১। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উৎকর্ষ সম্পর্কে **তাঁর যে অননুমোদন** সেটা এসেছিল তাঁর তপোবন সংস্কৃতির প্রতি আস্থা থেকে। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক ইউরোপ বিজ্ঞানের শক্তিকে বারবার বিশ্ব ধ্বংসে নিয়োজিত করেছে, তাও হতবুদ্ধি করেছিল তাঁকে। ··· যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিন্যাসের দ্বারা বিজ্ঞানকে সেই সার্বভৌম কল্যাণের পথে চালনা সম্ভব, **তাকে তিনি স্বাগত করেননি** এটা অবশ্য সত্যি, আর এই খানেই তাঁর একটু স্ব-বিরোধিতা ছিল।[৪]

অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজ্ঞান আলোচনা করতে যেয়ে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত পত্রে, তাঁর বিজ্ঞান সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের সারাংশটুকুরই প্রতিধ্বনি করেছেন ঃ

> বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের সকল মানুষের — এই জন্যই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকল রকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্য সে অস্ত্র গড়ছে, মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান। ··· যে সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে, সে সাধনা ধর্মের, কিন্তু যে সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।[৫]

তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপে বিজ্ঞানের বিধ্বংশী রূপ দেখে কোন দিনই হতবুদ্ধি হন নি, বরং শেষদিন পর্যন্ত তাদের সভ্যতাকে প্রশংসা করেছেন ঐ বিজ্ঞান বুদ্ধির কারণেই। রাশিয়ায় যেয়ে স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন : পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের যা দু বলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি।[৬] এখানে স্মরণযোগ্য জগদীশ বসুর বিজ্ঞান চর্চার ব্যায়ভার রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করতেন। তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় পাঠিয়ে বিজ্ঞানী করেছিলেন। অধিকন্তু বিজ্ঞান প্রচার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মৌলিক লোকায়ত প্রস্তাব ছিল :

> বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়। ··· বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক পরীক্ষা শক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তনক্রিয়ার যাথাযথ্য জন্মে। ··· ঘরেবাইরে চারিদিকে বিজ্ঞানের আলোককে সাধারণ ভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলে তবেই বিশেষভাবে বিজ্ঞানের চর্চা এদেশে স্থায়ীরূপে বর্ষিত হইতে পারিবে।[৭]

২। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বগত হওয়ার একটা সুমার্জিত চেতনা বর্তমান দেখা যায়, এবং তিনি বিশ্বগত হয়েও ছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ জীবন সম্পর্কের চেতনার মাধ্যমে নয়, উপনিষদ-লব্ধ-তত্ত্বের মাধ্যমে। ··· নিঃসন্দেহ যে ঐ তত্ত্ব ভারতীয় সমাজ-জীবনের বিশেষ এক ঐতিহাসিক লগ্নে উদ্ভূত হয়েছিল। সম্ভবতঃ তৎ-কালীন পরিবেশে ঐ ভাবধারার মধ্যেই সেকালের মানব সম্পর্কের সত্যরূপ ধরা পড়েছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে বহুশতাব্দী পরবর্তী কালের মানুষ আমরা আমাদের নিকটে ঐ তত্ত্ব নির্দিষ্ট অর্থসীমায় সীমিত, আধুনিক জীবন সম্পর্কের পটভূমিতে তা গতিহীন, কারণ তা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না।[৮]

কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একাধিক স্থানে বলেছেন জীবনের ধর্ম চলিষ্ণুতা। চলমানতা রবীন্দ্রপ্রতিভার মৌল বৈশিষ্ট্য। তাঁর মতে :

ক। ···স্মরণ রাখা কর্তব্য পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেই খান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ তুমিই কেবল একলা থামবে আর কেউ থামবে না জগৎ প্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি না চলতে পার তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপর এসে আঘাত করবে; একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে কিংবা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে

অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিশ্রাম চলো জীবনচর্চা এবং করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও, পৃথিবীর এই রকম নিয়ম।[৯]

খ। সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে এবং হইয়াই থাকে। সেই পরিবর্তনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। নহিলে আমাদের জীবনই নিষ্ফল। নহিলে, মিউজিয়মে প্রাচীনকালের জীবেরা যেমন করিয়া স্থিতি করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইবে।[১০]

৩। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন[১১] 'এ কথাও উপেক্ষা করা যায় না যে, এই সব কর্ম যত অবাঞ্ছিত, যত স্থূল এবং যত নিয়মবিরোধী হোক না কেন, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তার অবদানও কম নয়।' বস্তুতপক্ষে, এ-উক্তির পূর্ব-রূপ রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে দুর্লক্ষ্য নয়। ১৩১৪ সালের পাবনা অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে সরকার কথিত এক্সট্রিমিস্ট দলের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলেন ঃ

> লর্ড কার্জন, মর্লি, ইবেট্সন; গুর্খা, প্যুনিটিভ পুলিস ও পুলিস রাজকতার .. বিভীষিকার সম্মুখে অভিভূত না হইয়া (ইহারা) অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে আমাদের যথেষ্ট অসুবিধা ও আশঙ্কা আছে তাহা জানিতেই হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারি না যে, বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনও আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে—প্রবল ভাবে কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এখনও আমাদের মধ্যে যায় নাই — এবং জীবনধর্মে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্তমান এখনও আমাদের মধ্যে তাহা কাজ করিতেছে।··· অতএব, ইংরেজ এক্স্ট্রিমিষ্ট দল বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেটা কি একটা দল, না দলের চেয়ে বেশী—তাহা দেশের একটা লক্ষণ?[১২]

৪। উক্ত সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মিক সত্য এবং পরম মানবিক সত্যের অবৈজ্ঞানিকতা নির্দেশ করতে যেয়ে বলেছেন ঃ যদি তিনি ··· মানুষের জীবনের সত্যকে ঘটমান কর্মপ্রবাহ থেকে উপলব্ধির চেষ্টা করতেন, তা হলে এ সত্য নিশ্চয়ই উদ্ভাসিত হতো যে, আত্মিক সত্য অথবা পরম মানবিক সত্য বলে কোন সত্য নেই।[১৩] আমরা জানি ১৯১৭ সালের বলশেভিক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে রাশিয়ায় মার্ক্সিয় জীবন-বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়ায় গেলে ভক্স, সমিতি[১৪]

ও মস্কো লেখক সংঘ যৌথ ভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, এবং সভাপতি অভিনন্দন জানানোর সময় তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন :

> রবীন্দ্রনাথ শুধু যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও দ্রষ্টা তাহা নহে, তিনি জনসাধারণকে মানুষ হইবার জন্য শিক্ষাদানের একজন অগ্রণী, দক্ষ শিক্ষক। ··· আমাদের সোভিয়েট রাষ্ট্রে নীতি ও শিক্ষাপদ্ধতি যে কেবল মানবের বাস্তব জগতের সকল প্রকার বন্ধনের মুক্তির সাধনা শিক্ষা দেয় তাহা নহে—**মানব আত্মার ও আধ্যাত্মিক ভাবের** মুক্তির পথের সন্ধানও দেয়।[১৫]

উল্লিখিত বৈপরীত্যমূলক বক্তব্য থেকে একথা সুস্পষ্ট হবে যে রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণে কোথায় যেন একটা গ্রন্থি আছে। বাঙ্‌লা সমালোচনা সাহিত্যের যে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রমানস প্রসংগ উত্থাপিত হয়েছে অধিকাংশ প্রশ্নেই তা হয়েছে উদ্দেশ্য সমর্থনে আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত কোন ব্যাখ্যা আজো হয়নি, পক্ষান্তরে তাঁর কাব্য বিশ্লেষণে উপনিষদ প্রসংগ বার বার প্রাসংগিক এবং অপ্রাসংগিক ভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। এ কথা অত্যুক্তি নয় যে, রবীন্দ্রপ্রতিভার কাব্য-সৃষ্টি তার অখণ্ড মানসের এক কৌনিক বিচ্ছুরণ মাত্র, হযতবা একটা প্রধান নিয়ন্ত্রিণী শক্তি; তবে সার্বিক শক্তি নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে 'সোনার তরী পর্বের' কাব্যে যে জীবনবোধ প্রতিফলিত হয়েছে, ছিন্নপত্রে কি তার সুস্পষ্ট রূপ প্রকাশ পায় নি? আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তারাজ্যে কবিতা সম্পর্কে একটি ভিন্ন প্রবর্তনা সক্রিয় ছিল। কবিতা ব্যক্তিপুরুষের মর্মবাণীর পরিশোধিত নির্যাস মাত্র। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিমানস-বিশ্লেষণে কবিতার চেয়ে, তার গদ্য রচনা আরো বেশী নির্ভরযোগ্য। পক্ষান্তরে তাঁর সুবিশাল জীবনের বাণীরূপের খণ্ডাংশ মাত্র তার কাব্য প্রয়াস; সুতরাং কেবল মাত্র এই কাব্য পর্যায় লক্ষ্য করলে রবীন্দ্রপ্রতিভার কেন্দ্রিভূত সত্যটিকে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। উল্লিখিত বৈপরিত্যের সূত্রাবলী উক্ত কার্যকারণের মধ্যে সন্ধান করা অবৈজ্ঞানিক নয়।

প্রতিভাবান কিংবা সাধারণ মানুষের কোন প্রবণতাই যান্ত্রিক ভাবে বিভাজ্য নয়; কিংবা এ প্রসঙ্গে কোন সহজ সরলীকরণ অবৈজ্ঞানিক। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী — সে সাহিত্য বিষয়ক হোক আর ধর্ম-রাষ্ট্র-সমাজ প্রসঙ্গেই হোক, — তাঁর সমগ্র জীবনগঠনের উপাদান অর্থাৎ পরিবেশ ও আবহাওয়ার মধ্যে লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যপ্রিয়তা, বিশ্ববোধ, সমন্বয়বাদ, স্বাতন্ত্র্যে শ্রদ্ধাশীলতা, বৈদগ্ধ্য ও শিল্পদৃষ্টির প্রসারতা ইত্যাদি —তাঁর সমাজ-মন, শিল্পদৃষ্টি ও

ধর্মবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন সত্য নয়। বরং তাঁর শিল্পদৃষ্টি যেমন ধর্মবোধ ও সমাজমন দ্বারা প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত, তেমনি সমাজমন ও ধর্মবোধ প্রতিমূহূর্তে শিল্পদৃষ্টি দ্বারা পরিবর্তিত এবং রূপান্তরিত। বস্তুত সব কিছু উপাদান একত্রিভূত হয়ে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও জগতদর্শন।

২

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন-ধারণা এবং প্রজ্ঞা কেবল মাত্র জন্মগত সহজাতবোধ দিয়ে গড়ে ওঠে না। বস্তুজগতের অভিঘাত আমাদের অনুভব-তন্ত্রে সক্রিয় হয়েই জ্ঞানলাভের পথ নির্দেশ করে। বস্তুজগত বলতে স্থান (Space) এবং কাল (Time) বোঝায়। যুক্তিগত বিশ্লষণ দিয়ে আমরা বলতে পারি জ্ঞানের মূল উপাদান হচ্ছে সংবেদন; এবং উক্ত সংবেদন উদ্রিক্ত হয় স্থান-কাল-বিধৃত জগতের সহস্রমুখী অভিঘাতে।

কোন ব্যক্তিত্ব, যা প্রতিভার নিয়ন্ত্রণী শক্তি — গড়ে ওঠে স্থানকালধৃত জগতের উপর ভিত্তি করে। সুতরাং রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করতে হলে উক্ত জগত-কালের এবং অপরাপর উপাদানের সুষ্ঠু আলোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। 'মানস গঠনে সবচেয়ে কার্যকর উপাদান হচ্ছে ঐতিহ্য বা বংশানুক্রম এবং পরিবেশ। ঐতিহ্য হোল সেই শক্তি যা নিয়ে মানুষের জীবন শুরু। আর পরিবেশ বলতে বুঝি জন্মের পর থেকে ব্যক্তির উপর যা কিছু প্রভাব বিস্তার করে।[১৩] তবে একথা বৈজ্ঞানিক ভাবে সত্য যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐতিহ্য বাস্তবিক পক্ষে তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক গ্রহণীশক্তির উপর নির্ভরশীল। এবং গ্রহণীশক্তির উৎকর্ষ এবং চর্চা বহুলাংশে পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। পরিবেশ বলতে পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজকে ইঙ্গিত করা হয়। ধর্ম, আচার — ব্যবহার, ভাষা, রাজনীতি, অর্থনীতিক অবস্থা, নানা সংস্কৃতি-মূলক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য — ইত্যাদি মানুষের সামাজিক উত্তরাধিকার (Social heridity)। ফলত, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙলার পরিবেশ, আন্তর্জাতিক পরিবেশ এবং ঠাকুরবাড়ীর মানসিক প্রবণতা এবং সমকালীন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করলে স্পষ্ট হবে যে — কেবল মাত্র উপনিষদের প্রবর্তনা তাকে বিশ্বব্যাপ্ত করেনি; বরং কাল এবং যুগের অত্যাশ্চার্য গতি তাঁকে পরিব্যাপ্ত করেছে, পরিবর্তনশীল করেছে। এই যুগানুগ রূপান্তরশীলতা রবীন্দ্রপ্রতিভার মৌল এবং বিভ্রান্তিকর বৈশিষ্ট্য। বস্তুত, এই বিবর্তনশীলতাকে সম্ভব

করেছে রেনেসাঁস-উত্তর মানবতা, বিজ্ঞানবোধ এবং যুক্তিবাদ। রবীন্দ্রনাথের আচার-হীন কল্যাণধর্ম (যা বিশ্বের বিচিত্র ধর্মের সারকথা) — যাকে তিনি মানুষের ধর্ম বলেছেন, তা সম্ভব হয়েছিল রেনেসাঁস-উত্তর মানবতাবোধে পরিস্রুত হয়ে ; সেখানে উপনিষদের প্রবর্তনা প্রাথমিক শর্ত মাত্র। বিশ্বমানবের কল্যাণকামনায় রবীন্দ্রমানস উৎসারিত বলে, তিনি সমন্বয়বাদী। রবীন্দ্রনাথের আবাল্য জ্ঞানচর্চা তাঁকে জানিয়েছিল, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মূলকথা সমন্বয়। বস্তুত রেনেসাঁস-উত্তর বিশ্বপ্রসারী মানবিকতা, মানব-কল্যাণবোধই—রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের, (শিল্পীমানসের), এমন কি ধর্মবোধেরও, নিয়ন্ত্রণী শক্তি। এরই প্রয়োজনে তিনি নিয়ত পরিবর্তিত হয়েছেন।

৩

রবীন্দ্রমানস সম্পর্কিত উল্লিখিত মন্তব্যের সত্য-প্রমাণ সন্ধানে আমাদের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল উপাদান ১। ঐতিহ্য ২। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার বিশ্লেষণ করতে হবে।

| ঐতিহ্য |

ঠাকুর গোষ্ঠীর আদিপুরুষ জগন্নাথ কুশারী তুর্কী পাঠানদের শাসনকালে পীরালি ঘরে বিয়ে করে সমাজে পতিত হন। এর কয়েক পুরুষ পরে পঞ্চানন ও তাঁর কাকা শুকদেব পারিবারিক মনমালিন্য হেতু আদিগঙ্গার ধারে গোবিন্দপুর গ্রামে, সৎব্যবসায়ী জেলে মালো কৈবর্ত এবং পুন্ন বণিকদের মধ্যে এসে বসবাস করতে থাকেন। এখান থেকেই ঠাকুর উপাধীর সূত্রপাত।[১৭] পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম ইংরেজ কোম্পানীর আমিনগিরি করে অর্থ উপার্জন করতেন। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে নীলমণি ও দর্পনারায়ণ হলেন যথাক্রমে জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ। নীলমণি উড়িষ্যার কালেক্টরি বিভাগে চাকুরি পান। দর্পনারায়ণ কলকাতায় নানা ভাবে অর্থ উপার্জন করতেন। কিন্তু পারিবারিক কলহ হেতু নীলমণি চিৎপুর রাস্তার পূর্বে, মেছো বাজারে, ঘর উঠালেন; এটা ১৭৮৪ সাল। পিতার মৃত্যুর পর রামলোচন অভিভাবক হলেন।[১৮] রামলোচন ঠাকুর ছিলেন তৎকালীন আদর্শে বিশিষ্ট বা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। বেশভূষায় পারিপাট্য, সান্ধ্যভ্রমণ, সংগীতাদির প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি তৎকালীন আভিজাত্যের লক্ষণ তাঁর জীবনে দেখা যায়।[১৯]

নিঃসন্তান রামলোচন ঠাকুর দ্বারকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের চরিত্রের উপর রামলোচনের আভিজাত্য, সংগীতানুরাগ ও রুচিবোধ সক্রিয় হয়েছিল, ধারণা করা যেতে পারে। এছাড়া ঠাকুরবংশের আদিপুরুষ ছিলেন বেনীসংহার গ্রন্থের রচয়িতা। হলায়ূধ, জগন্নাথ, পুরুষোত্তম, বলরাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ—এঁরা সকলেই এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[২০]

নীলমণির কাল থেকেই ঠাকুর পরিবার ইংরেজ সংসর্গে এসেছিল। এমন কি দ্বারকানাথের জৈষ্ঠ্য ভ্রাতা রাধানাথ ইংরেজিতে কৃতবিদ্য লোক ছিলেন।[২১] সুতরাং সহজেই ধারণা করা চলতে পারে যে রেনেসাঁসের হাওয়া এ সময় থেকেই ঠাকুর পরিবারকে মৃদু দোলা দিচ্ছিল। এটা অষ্টাদশ শতকের শেষাব্দ। রাধানাথের শিক্ষানুরাগ পূর্ণ মর্যাদা পেল দ্বারকানাথে এসে। তিনি বাল্যকাল থেকে পারসী ও ইংরাজিভাষা ভালোভাবেই শিক্ষা করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সমাজে পতিত হবার পর থেকেই জগন্নাথ ঠাকুর, নীলমণি — দর্পনারায়ন এবং রাধানাথ সকলেই অর্থোপার্জনকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। সমাজসত্য অনুসারে তাঁরা সকলেই ছিলেন কর্মযোগী, বাস্তববাদী। দ্বারকানাথ ঠাকুর, সাহিত্যানুরাগ, আভিজাত্য এবং রুচিবোধের সঙ্গে, এই বাস্তববাদী মনোভঙ্গীকে-ও অঙ্গিকার করেছিলেন। ফলে তিনি ম্যাকিন্‌টসের সামান্য গোমস্তা থেকে কঠোর সাধনার ফলে চব্বিশ পরগনার কলেকটর ও নিম্‌কি দেওয়ান (Salt agent) পদে নিযুক্ত হন। তখন নিমক মহলের দেওয়ানী নিলেই লোকে দুদিনে ধনী হয়ে উঠত।[২২] বাঙলার রেনেসাঁসের স্বরূপ ও উদ্ভবের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুরের অচেতন অথবা সচেতন যোগাযোগ ছিল। বাঙলার শিক্ষিত ধনিক ও মধ্যবিত্ত-শ্রেণী পরস্পর সহযোগিতায় নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করেছিল। কারণ মধ্যবিত্ত এবং জাতীয় ধনিক-শ্রেণীর উদ্ভবই বাঙলার রেনেসাঁসের উদ্ভব।[২৩] দ্বারকানাথের মতো উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এজেন্‌সি হাউসগুলির দেওয়ানী মুৎসদ্দীগিরি করতেন, কিন্তু ১৮১৩ সালে বৃটিশ পুঁজিপতিদের অবাধ বাণিজ্যের অবকাশ দেয়ার ফলে, পরবর্তীকালে তাঁরা বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান ও এজেন্ট নিযুক্ত হতেন। দ্বারকানাথ ও রামমোহনের জীবনে সূত্র-পর্যায়ও সত্য। ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা যেমন রেনেসাঁসের লক্ষণ তেমনি মানবতাও ছিল নবচেতনার নিয়ন্ত্রণশক্তি। পার্থিব ও জাগতিক তৃপ্তিকে বড় করে দেখেছিলেন ইঁরা। রেনেসাঁস উত্তর মানবতার (Humanism) প্রভাবেই তিনি হিন্দু-কলেজ, মেডিক্যাল-কলেজ ও জমিদার সভা স্থাপন, সতীদাহ নিবারণ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে সাহায্য

করেছিলেন। সর্বপ্রকার লোকহিতকর ও সমাজসংস্কার মূলক কাজে তিনি রামমোহন রায়ের প্রধান সহায়ক ছিলেন। শিক্ষানুরাগী বিলাতপ্রবাসী দুজন ছাত্রের ব্যয় ভার গ্রহণেও তিনি উৎসাহী হয়েছিলেন। পার্থিবজীবন ভোগে উৎসাহ রেনেসাঁসের ধর্ম। মাইকেল মধুসূদন দত্তের এবং ইয়ংবেঙ্গল দলের জীবনদর্শন তার প্রমাণ। ধর্ম সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের নীরবতা তার দৃষ্টান্ত। ১৮৩৩ থেকে পরবর্তী কালে ধর্মীয় কোন-সংস্কারই তাঁর জীবনে প্রভাব বিস্তার করেনি। তিনি হিন্দুর সাধারণ সংস্কার পর্যন্ত ত্যাগ করেন।[২৪] ১৮৪৪ সালে দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যান। বিলাতে দ্বারকানাথ অকল্পনীয় বিলাস ও বৈভবের মধ্যে থাকতেন। মধুসূদন দত্তের ঐশ্বর্য-কামনা যে রেনেসাঁস এবং বস্তুবোধ থেকে উৎসারিত হয়ে ট্রাজিক পরিণতি এনেছিল, অবস্থানুকুল্যে দ্বারকানাথ তা ভোগ করেছিলেন। আড়ম্বরপ্রিয়তার জন্যই ইংলণ্ডের সকলে তাঁকে প্রিন্স দ্বারকানাথ বলত। ইংলণ্ডেই তাঁর মৃত্যু হয় ১লা আগষ্ট, ১৮৪৬।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫) দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রথম বয়সে তিনি পিতার মতই বস্তুবাদী ছিলেন। অল্পবয়সে মায়ের মৃত্যুর ফলে[২৫] দেবেন্দ্রনাথ গৃহসংসারের কর্তৃত্ব পেয়ে যদৃচ্ছভাবে জীবন যাপন করতে থাকেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর পিতার ঋণ শুধু নয়, পিতার লক্ষাধিক টাকার চাঁদা বহু বৎসরে তিনি শোধ করেন। দেবেন্দ্রনাথ যুবক বয়সেই আধ্যাত্মজগতের দিকে ঝুঁকে পড়েন। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব, পিতার ধর্মসংক্রান্ত-অনীহার প্রশ্নে মাতার যন্ত্রণা ও মৃত্যুবরণ, তাঁকে ধর্ম আলোচনায় উৎসাহিত করেছিল মনে করা যেতে পারে। ১৮৪৩ এর ২২শে ডিসেম্বর তিনি রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এর পর পিতার মৃত্যু ও আকস্মিক দারিদ্র্য তাঁকে আরো বেশী মন্ময় (Subjective) করে তুলেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানস-গঠনে ঐতিহ্য বিচার এ পর্যন্ত প্রাসংগিক। কারণ দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তার পরিবেশ (Social Heridity) অংশের অন্তর্ভুক্ত। উল্লিখিত আলোচনা থেকে রবীন্দ্রমানসের উপাদান নির্দেশ করতে পারি।

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ সমাজে পতিত হয়েছিলেন, এমন কি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ফলে সমাজের আন্তরিক সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ফলে বর্ণ-সংস্কারের প্রতি তাঁদের কেবলমাত্র অশ্রদ্ধা ছিল তাই নয়, নিম্ন সাধারণ মানুষের প্রতি একটি অকৃত্রিম আন্তরিকতা রবীন্দ্রনাথ জন্মগতসূত্রে পেয়েছিলেন।

খ. হলায়ুধ, জগন্নাথ, পুরুষোত্তম, বলরাম প্রভৃতির জ্ঞানানুরাগ ও সৃষ্টিক্ষমতা, রাম-লোচনের সৌন্দর্যানুরাগ সংগীতানুরাগ রবীন্দ্রনাথের মানস-গঠনে ঐতিহ্য হিসাবে সক্রিয় থাকতে পারে। নীলমণির কাল থেকেই ঠাকুর পরিবার ইংরেজ সংসর্গে এসেছিল এবং দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধানাথ ইংরেজি বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। সুতরাং বংশানুক্রমিক সৃষ্টিপ্রজ্ঞা, শিল্পানুরাগ ও জ্ঞানানুরাগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছিলেন।

গ. বাঙালী চরিত্রের কূপমণ্ডুকতার মূলকারণ হিসাবে 'এশিয়াটিক সোসাইটির' অচল-অনড়, জড় সমাজব্যবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতাকে দায়ী করা যেতে পারে।[২৬] কিন্তু ঠাকুর পরিবারের পূর্ব-পুরুষ সামাজিক দুর্ঘটনায় অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকেই গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হন। তখন কলকাতায় পাশ্চাত্য মানসিকতার বীজ বাতাসে উড়তে শুরু করেছে। কলকাতায় অন্নসংস্থানের জন্য ঠাকুর পরিবারকে ইংরেজ বণিকদের সাহচর্যে আনতে হয়। ফলে বাঙালির তথাকথিত আত্মসর্বস্ব মানসিকতাকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাঁদের। দ্বারকানাথ ঠাকুর ধ্যান-ধারনায় অনেকাংশে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছিলেন। বিলাতের মানুষের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। ধর্মের প্রশ্নে সংস্কারহীনতা ও রেনেসাঁসের মূল-মন্ত্র মানবতাবোধের জন্যেই তিনি গৃহটান এবং সংস্কার-বন্ধনকে অস্বীকার করে সাগর পার হতে পেরেছিলেন। এই আন্তর্জাতিক মানসিকতা ঠাকুর পরিবারে সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রমানসে এই আন্তর্জাতিকতা বৃহৎ-মানব-কল্যাণ-ভাবনায় রূপ পেয়েছিল।

ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ থেকে দ্বারকানাথ পর্যন্ত সকলেই কর্মযোগী এবং বাস্তববাদী ছিলেন। সমাজে পতিত হবার পর সামাজিক প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড হিসাবে তাঁরা অর্থকেই গ্রহণ করেছিলেন; নীলমণি, দর্পনারায়ন থেকে দ্বারকানাথ পর্যন্ত সকলেই সমাজে এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন কর্মের এবং বুদ্ধিচর্চার মাধ্যমে। অর্থাৎ রেনেসাঁসের যুক্তিবাদ, পার্থিবচেতনা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক প্রশ্নে নগদ 'মুদ্রা-চেতনা' তাঁদের ছিল। দ্বারকানাথের ভোগবাদী-মন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম যৌবনের আড়ম্বর — উক্ত ঐহিকচেতনা থেকে উৎসারিত।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে এসে বস্তুলোকের ও অধ্যাত্মলোকের সমন্বয় হল।

ভোগবৃত্তি ও ত্যাগবৃত্তি তাঁর চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কিভাবে পারিবারিক ধর্মচেতনা, মাতার করুণ মৃত্যু এবং আকস্মিক দারিদ্র তাঁকে আধ্যাত্মিক এবং মন্ময় করে তুলেছিল। সুতরাং যুগানুগ প্রবর্তনা এবং ব্যক্তিশিক্ষার ফলে এবং রামমোহনের প্রভাবে উক্ত পার্থিবচেতনা ও অধ্যাত্মচেতনা একটি দার্শনিক ভিত্তিতে পরিশ্রুত রূপ নিয়েছিল। আন্তর্জাতিক মানসিকতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঐতিহ্যসূত্রে বহন করেছিলেন। ফলে পার্থিবচেতনা, মানবত্তা, আন্তর্জাতিক মন, আধ্যাত্মিকতা, কর্মপ্রবণতা এবং সর্বোপরি দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথের অদম্য বিদ্যা-শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতা-নুরাগ ঐতিহ্যসূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পেয়েছিলেন।

। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা ।

ঐতিহ্যসূত্রে যত গুণাবলীই ব্যক্তি-চরিত্রে উপ্ত থাকনা কেন, অনুকূল পরিবেশ না পেলে তার বিকাশ সম্ভব হয় না। ঠাকুর বাড়ীর পারিবারিক পরিবেশ আলো-চনার পূর্বে তৎকালীন দেশকালের কয়েকটি ইঙ্গিত দেবার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্র-নাথের বাল্যকালে 'বাঙলার রেনেসাঁস' পরাধীন দেশের সম্ভাব্য স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ নিয়েছে। রামমোহন, অক্ষয়চন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি আরও অনেক মনীষীর অবির্ভাব ঘটেছে। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের নীতিগত আদর্শ-সংঘর্ষ, ডিরোজিও-অনুসারীদের উচ্ছৃংখলতা বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে স্থিতি লাভ করেছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রেনেসাঁসকে অঙ্গিকার করেছেন আন্তরিক সাযুজ্য ঘটিয়ে; তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ও সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্যে কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী-দেবী পাশ্চাত্য শিক্ষানুকুল্যে যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং সর্বোপরি নব্য-শিল্পবোধকে জীবানার্থের ধারক ও পোষক বলে মনে করতেন। একান্নবর্তিপরিবারের ফলে সামগ্রিক চিন্তার এবং ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রিত রূপের পরিবেশ হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী।

১. পারিবারিক পরিবেশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছিলেন সেকেলে কলকাতায়। উনিশ শতকের ষষ্টদশকের প্রথম পাদে শহরে ছ্যাকড়া গাড়ি ছুটতো ছড়্ ছড়্ করে ধুলো উড়িয়ে। বাবুরা আপিসে যেতেন তামাক টেনে পান চিবোতে চিবোতে। চলার জীবনে অধুনাকালের

মত যান্ত্রিকগতি তখনো আসেনি। মেয়েদের বাইরে বেরোবার স্বাধীনতা ছিল সমাজ নিন্দিত। তারা বাইরে যেত দরজাবন্ধ পালকির অন্ধকারে। তখন শহরে ছিল না গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি। কেরোসিনের বাতি সগু প্রচলিত হয়েছে।[২৭]

ঠাকুর বাড়ীর মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।[২৮] বাঙ্‌লাদেশের মেয়েদের পর্দা অবরোধ প্রথা ভাংবার জন্য আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী ছিলেন অগ্রণী। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের প্রথম আই. সি. এস, তিনি আধুনিক জীবনচর্যায় পিতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। অনেকাংশে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমতেই তিনি কন্যা ইন্দিরাকে সাহেবী স্কুলে দিয়ে ফরাসী সাহিত্য ও ভাষায় এবং য়ুরোপীয় সংগীত বিস্তায় পারদর্শী করেন।[২৯] জীবন বিন্যাস এবং ধ্যান-ধারণার প্রশ্নে তিনি পাশ্চাত্যানুসারী ছিলেন।

অপরপক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নারী স্বাধীনতার সাক্ষ্য হিসাবে নিজে স্বীয় স্ত্রীকে ঘোড়ায় চড়িয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন। এটি সেকেলে সমাজের প্রতি ছিল প্রবল আঘাত। এদিক দিয়ে স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায় যে, রেনেসাঁস উদ্ভূত নবচেতনা, যুক্তিবাদ এবং সংস্কার উপেক্ষার প্রচণ্ড বিদ্রোহশক্তি ঠাকুর পরিবারে সক্রিয় ছিল। এই ঐহিকতাবাদী এবং পার্থিবচেতনা সমৃদ্ধ পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বষ্টিমানস গঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের পরের বৎসর থেকেই সকল রকমের পৌত্তলিকতা ঠাকুরবাড়ী থেকে বিলুপ্ত হয়।[৩০] স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক পরিবেশ থেকে কোন প্রকার সংকীর্ণতার যন্ত্রণা এবং মন্ত্রণা অনুভব করেন নি। সংস্কারের প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে কিছু পশ্চাদ্‌আকর্ষণ ছিল বটে, তবে দাদা-দিদিদের পাশ্চাত্য প্রভাবিত জীবনাচারণ আদর্শের কাছে সেটি ছিল অতি নগন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলায় পরিবারের মধ্যে দিনরাত্রি সাহিত্যের আবহাওয়া থাকত।[৩১] পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং আমরণ সাহিত্যানুরাগী এবং জ্ঞানানুশীল ব্রতী ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন ঃ

> কোন এক সময়ে পিতৃদেব সাহেবগঞ্জে গঙ্গাবক্ষে বজ্‌রায় অবস্থিতি করিতে ছিলেন।··· আমি যখন গেলাম, তখন তিনি ইংরেজি অনুবাদের সহিত মিলাইয়া, অভিধানের সাহায্যে ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ণ করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে, যে অংশ বুঝিতে পারিতেছিলেন না, আমাকে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, আমি অল্প স্বল্প ফরাসী জানি।[৩২]

বিশুদ্ধ সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী ঠাকুর পরিবারের বেতনভুক গায়ক ছিলেন। ভাল ভাল গায়ককেও তিনি আশ্রয় দিতেন—তার মধ্যে শ্রীরমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুভট্ট, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার মতিবাবুর ভাই রামচন্দ্রবাবু উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগীত-উৎসাহে উদারহস্ত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করলে তিনি এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন।[৩৩]

জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০—১৯২৬) কাব্য, দর্শনে, সংগীতে ও গণিতে অসামান্য প্রতিভা ছিল। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি 'মেঘদূতের' পদ্য অনুবাদ করেন। তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ—রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জুগিয়েছিল। তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথের অসংখ্য সারগর্ভ রচনা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২—১৯২৩) সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধরণ অধিকার আয়ত্ত করেন। তাঁর গীতা, মেঘদূতের পদ্যানুবাদ (১৯০৫), আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস এবং বৌদ্ধধর্ম সুবিদিত। এছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সংস্কার-মুক্ত বিদ্রোহীপুরুষ। তাঁর নাটক সুপরিচিত। তাঁর প্রাচীন ভারত সম্পর্কিত গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ প্রবাসীর পৃষ্ঠাকে তথ্যপূর্ণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী বঙ্গসাহিত্যে স্ত্রী-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে (সার্থকতার প্রশ্নে) প্রথম কথা-শিল্পী।[৩৪] কাজেই উল্লিখিত সৃষ্টিক্ষম-প্রতিভার সংস্পর্শে, বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রমানস লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে পেরেছিল।

যে সংসারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও মানুষ হয়েছিলেন সে সংসারের বাস্তোস্পতি এবং শক্তিকেন্দ্র ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বৈদিক অর্থে দম্পতি; সংস্কৃত অর্থে কুলপতি এবং লাটিন অর্থে Pater familias ছিলেন।[৩৫] তবুও একথা সত্য যে বাল্যকালে রবীন্দ্রমানসের নিয়ন্ত্রণী শক্তি ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বৌঠাকুরানী কাদম্বরী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্য পেয়েছিলেন কয়েকমাস মাত্র, পিতার ভ্রমণের সঙ্গী হিসাবে। এই কয়মাসেই তিনি উপক্রমণিকা ছাড়াও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঋজুপাঠও পড়া আরম্ভ হয়।[৩৬] মাত্র কয়েক মাস হলেও — সংস্কৃত, ইংরেজি, জ্যোতিষ ও ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্তনা রবীন্দ্রমানসের ক্রমবিকাশে উল্লেখযোগ্য উপাদান।

তবুও রবীন্দ্রমানসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। শাসন বন্ধনের অবরোধ থেকে বালককে যিনি মুক্তি দেন — তিনিই রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

> পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তা হলে ভেঙ্গে চুরে তেড়ে বেঁকে যা হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তবা ভদ্র সমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।[৩৭]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বালক ভাইকে শুধু সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চায় নয়, আমোদ-উৎসবেও নিয়ে যেতেন। তখনকার কালে বালকের সঙ্গে এমন অসংকোচ ব্যবহার রীতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ঘোড়ায় চড়া থেকে শিকার সঙ্গী পর্যন্ত করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রেনেসাঁসের সর্বসংস্কারহীন — মানববাদী বিদ্রোহী ব্যক্তি; তাঁর আনুকুল্যেই বিশ্বজগতের সহস্র সংবাদ রবীন্দ্রমানসে ছায়াপাত করত।

এই প্রসঙ্গে চাকরদের কথার উল্লেখ অপরিহার্য। ভৃত্য-শাসনের ফলে পরোক্ষ উপকার হয়েছিল দুপ্রকারে। এক, ঘরের কোনে জানালার ধারে গণ্ডীবদ্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথ শিশুমনকে বাইরের দিকে উধাও ছুটোতে পেরেছিলেন; অর্থাৎ দেহের নিগড় কল্পনাকে বাধামুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছিল। দুই, প্রয়োজনের ও লোভের বস্তুর জন্যে হাত না বাড়ানোর অভ্যাস আপনিই হয়ে গিয়েছিল, আর আদর-অনাদর সম্বন্ধে মন অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে উঠেছিল। তবে পরোক্ষ অপকারও যে কিছু হয়নি তা নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে বরাবরই একটু মুখচোরা, সঙ্কোচশীল ভাব ছিল।[৩৮] সুকুমার সেনের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত নয়, বরং রবীন্দ্রমানসে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রবীন্দ্রমানসের সাহিত্যসৃষ্টি-প্রজ্ঞায় ভৃত্যদের প্রভাব আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য, ভৃত্যদের মধ্যে শিক্ষার এবং কাব্যচর্চার প্রচলন ছিল। এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাদের শ্রোতা। রামায়ন, মহাভারত এবং চাণক্য শ্লোকের বাংলা অনুবাদ ছিল তাদের পাঠ্য। ভৃত্য ব্রজেশ্বর ঠাকুর বাড়িতে চাকরি নেবার আগে পাঠশালার গুরু মহাশয় ছিল।[৩৯] পাঠশালার এই প্রাক্তন গুরুমহাশয় ব্রজেশ্বরই রবীন্দ্রপ্রতিভার উদ্বোধনের আদি গুরু। উল্লিখিত আলোচনার সূত্র নির্দেশ করে বলা চলতে পারে ঃ

ক. ঠাকুর বাড়ির শিল্প-সাহিত্যিক ও সঙ্গীতানুরাগী পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতাগুলিকে বিকাশের অনুপন্থী জল-হাওয়া জুগিয়েছিল। এবং তৎকাল-উদ্ভূত নবচেতনা সুতীব্র হয়ে তাঁর সৃষ্টি-মানসে রেখাপাত করেছিল।

খ. দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের মধ্যে দুটি উপাদান লক্ষ্যণীয়; প্রথম, তাঁর আমরণ কর্ম যোগ; দ্বিতীয়, বাস্তবজীবনের নিছক ভোগবৃত্তির প্রতি অনীহা। একটা বৈরাগ্যের পরিমণ্ডলে তিনি বাস করতেন সর্বদা। এটিই রবীন্দ্রমানসে নিরাসক্তির রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ-নিরাসক্তি জড়িত তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে এবং রাষ্ট্র-সামাজিক দর্শনে। এই নিরাসক্তিই (detachment) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং ব্যক্তিগত সমস্যাকীর্ণ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথকে সংকীর্ণ-স্বার্থের উর্ধে উঠতে সাহায্য করেছে।

গ. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক জীবনাচরণের সারসত্যকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কারের উর্ধে উঠে মানবিক ও বস্তু-লৌকিক দৃষ্টিকোণ অর্জন করেন, এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবণতা অনুসারে ভারতের অতীত গৌরবের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে উৎসাহী হন। ফলত, এরই প্রভাবে রবীন্দ্রমানস পাশ্চাত্য জগত থেকে অতীত ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

লক্ষ্য করা যায় যে — প্রাচীন ভারত, বর্তমান বাঙলা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রিত মানসিকতা ঠাকুর বাড়িতে তখন পরিব্যাপ্ত ছিল। স্মরণীয় যে, দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে বিলাসী-শ্রেষ্ঠ হলেও বাঙালী পোষাক তিনি পরিত্যাগ করেন নি; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই. সি. এস. হয়েও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর নাট্যসাহিত্যে নিপীড়িত ভারতের যন্ত্রণাকে অঙ্কিত করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসুর সহায়তায় মাৎসীনি প্রদর্শিত গুপ্ত-সংস্থার অনুরূপ সঞ্জিবনী সভা স্থাপন করেছিলেন। উক্ত সামগ্রিক পরিবেশের সঙ্গে জড়িত থেকে রবীন্দ্রমানস সমন্বয়বাদী হয়ে উঠেছিল। এই মানসিক বৃত্তিগুলি রেনেসাঁস-উত্তর সর্বমানবিকতাবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে — রবীন্দ্রমানসের গঠনপর্যায়ে নিয়ন্ত্রণী শক্তি রূপে সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের মানসিক পরিবর্তনশীলতার কার্যকারণ অনেকাংশে এই সমন্বয়বাদী চেতনার মধ্যে নিহিত।

২. ব্যক্তি-শিক্ষা।

প্রতিভার গ্রহণী শক্তি সম্পূর্ণতই নির্ভরশীল — আত্মবিকাশ-চর্চার উপর। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যয়ের কষ্টপ্রয়াসে আমরা আবাল্য জানতে শিখেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয়ে কোনদিন শিক্ষা লাভ করতে পারেন নি। তিনি ছ'বছর বয়সে ওরিয়েণ্ট সেমিনারিতে ভর্তি হন। অতঃপর নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেণ্টজেবিয়ার্স প্রভৃতি শিক্ষালয়ে তাঁকে ভর্তি করা হয়, তাঁর মানসিক সাযুজ্য লাভের জন্যে; কিন্তু বিদ্যালয়-শিক্ষার কোন সুবর্ণ লক্ষণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোন দিন দেখা যায়নি। ১৮৭৬ সালে তাঁর বিদ্যালয় জীবন ব্যর্থতার মধ্যদিয়ে শেষ হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা জীবনের এটি চূড়ান্ত নির্দেশ নয়। একথা স্বতঃস্বীকার্য যে, কোন অধ্যাত্ম শক্তির প্রসাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পরিস্রুত সৃষ্টিমানস পাননি। কঠিন নিয়মানুবর্তিতা, সাধনা, সঠিক পাঠ নির্দেশ — তাকে মহোত্তম সৃষ্টি ক্ষমতার অধিকারী করেছিল। অতি নগন্য প্রতিভাই রবীন্দ্রনাথের মত জ্ঞানার্জনে এত বাধ্যবাধক এবং স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহী ছিলেন।

বালক রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক কর্মতালিকা শিক্ষাতালিকারই নামান্তর। তাঁর বয়স যখন ছয়-সাত থেকে সাত আট বছরের মধ্যে তখন প্রত্যহ সকাল পাঁচটা থেকে ছয়টা তাঁকে কুস্তি লড়তে হত।[৪০] সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত বোধোদয়, চারুপাঠ, বস্তুবিচার, পাটিগণিত, সীতার বনবাস পড়তে হত।[৪১] এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত তিনি রামায়ণ-মহাভারত ও পাঁচালী গান শ্রবণ করতেন।[৪২]

বয়স বাড়ার সংগে সংগে তাঁর নিয়মানুবর্তিতা আরো বেড়ে গেল। পাঠ্য বিষয়ের বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেল। সাত আট বছর থেকে নয় দশ বছর পর্যন্ত তাঁকে সকাল ৫টা থেকে ৬টা কুস্তি; ৬টা থেকে ৭টা অস্থিবিদ্যা;[৪৩] ৭টা থেকে ৮টা ভূগোল, ইতিহাস, বস্তুবিচার, মেঘনাদবধকাব্য, চারুপাঠ, প্রাণি-বৃত্তান্ত, পাটিগণিত, রেখা গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি;[৪৪] এবং ৯টা থেকে ৯-৩০ পর্যন্ত মুগ্ধবোধ অধ্যয়ণ করতে হত।[৪৫] বেলা সাড়ে দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত থাকতো স্কুল। পুনর্বায় বিকেল সাড়ে চারটা থেকে সোয়া পাঁচটা পর্যন্ত প্যারালাল বার;[৪৬] সোয়া পাঁচটা থেকে ৬টা চিত্রাংকন;[৪৭] সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ইংরেজি ফাষ্ট বুক, সেকেণ্ড বুক, মকলক্স কোর্স অব রীডিং ইত্যাদির অনুশীলন করতে হত।[৪৮] এমন কি রবিবারেও ছুটি ছিল না বলতে গেলে। সেদিন সকাল ৬টা থেকে ৭টা গান, এবং ৭টা থেকে ৯টা যন্ত্রপাতি-যোগে প্রকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করতে হত।[৪৯]

উল্লিখিত তথ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্ঞানোন্মেষ নিয়মিত এবং সুপরিকল্পিত ভাবে হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য যে, তিনি যেমন মুগ্ধবোধ এবং সীতার বনবাস পড়েছেন, তেমনি পাশ্চাত্য বিষয় পড়েছেন সমপরিমাণে। পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানচর্চা এ সময়েই শুরু হয়। তাঁর বাল্য শিক্ষার মধ্যে কোন ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয় নি, অর্থাৎ তিনি যেমন প্রাচ্য বিষয়ে জ্ঞানচর্চা করেছেন, তেমনি পাশ্চাত্যবিষয়েও মনশ্চর্চা করেছেন।

যাহোক, নীলকমল ঘোষাল এবং হেরেম্ব তত্ত্বরত্ন বিদায় হবার পর রামসর্বস্ব এসে অর্থ ক'রে শকুন্তলা পড়াতেন। অপরপক্ষে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য কুমারসম্ভব শুরু করালেন।

ঐ সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি কাব্য শুরু হয়েছিল। শিক্ষক মহাশয় ম্যাকবেথের তর্জমা করাতেন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। স্কুলের বাঁধাধরা পাঠ্য তালিকার বাইরে অ-পাঠ্য বইয়ের উপরেই অর্থাৎ মানসিক প্রবণতা অনুসারী জ্ঞানর্জনের দিকে বালক রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ অধিক ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ শিশুপাঠ্য পুস্তক নয়, কিন্তু তিনি বাল্যকালে বারবার পড়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলমারিতে অনেক দামী বইয়ের মধ্যে ছিল অবোধবন্ধু ও বিবিধার্থসংগ্রহ সাময়িকপত্র আর বৈষ্ণব-পদাবলী। অবোধবন্ধুতে ফরাসী উপন্যাস পৌল ও বর্জিনিয়ার ধারাবাহিক তর্জমা বের হয়, প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে দুটি তরুণ-তরুণীর জীবনের করুণ কাহিনী পড়তে পড়তে বালকের মন বেদনায় ভরে ওঠে। বিবিধার্থ সগ্রহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন :

> সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তপোষের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হল তিমি মৎসের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুক জনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।[৫০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিহারীলালের নিসর্গ সন্দর্শন, বঙ্গসুন্দরী ও সুরবালাকাব্য এই অবোধবন্ধু পত্রিকাতেই পড়েন। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যুগান্তর এল— বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনরূপে (১৮৭২)। এগার বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু এই অল্প বয়সে তিনি বঙ্গদর্শনের সবকিছু পড়ে ফেলতেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ, কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, আরব্য উপন্যাস, বাংলা রবিনসন ক্রুসো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবন চরিত, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের বিস্তর গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন।[৫১]

রবীন্দ্রজীবনীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা — সতের বৎসর বয়সে তাঁর আহমেদাবাদ গমন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সেখানকার জজ। এখানে ইংরেজী কথোপকথনে উপযুক্ত করে তাঁকে বিলাতে ব্যারিষ্টার করার উদ্দেশ্যে প্রেরণই কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা। এতদিন শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্যরুচি সম্পর্কে তাঁর একটি মানসিকতা গঠিত হয়েছিল, কিন্তু যে সমন্বয়-আদর্শের জন্যে নব কাব্যাদর্শকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, সংগীতচিন্তায় ও শিল্পে অভিনব হতে পেরেছিলেন সে প্রবর্তনার শুরু (যদিও আগে থেকে পরোক্ষভাবে শুরু হয়েছিল) এই আহমেদাবাদ থেকে। সতের বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরীতে বসে টেনিসনের কাব্য গ্রন্থ নিজের চেষ্টাতেই পড়েন। এবং ডোর. এর আঁকা উক্ত বইসংক্রান্ত ছবিগুলির মধ্যেও ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে ইংরাজি সাহিত্য ও ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসের বই আনিয়ে নিয়েছিলেন।

> মেজ দাদাকে বলিলাম আমি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন। তিনি আমার সম্মুখে টেন (Taine) প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম।[৫২]

এই সময়কার প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি লক্ষ্য করলে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় পাশ্চাত্য সাহিত্য চিন্তা সম্পর্কে সতের বছর বয়সে তিনি কি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ঃ

১। স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য।[৫৩]
২। নর্মান জাতি ও অ্যাংলো নর্মান সাহিত্য[৫৪]
৩। বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য।[৫৫]
৪। পিত্রার্ক ও লরা।[৫৬]
৫। গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ।[৫৭]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যত্র (Talks in China 1924) উল্লিখিত তথ্যের স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

> **When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through an English translation ... I also wanted**

> to know German literature and by reading Heine in translation, ... Then I tried Goethe.[৫৮]

বিলাত প্রবাসকালে (১৮৭৮) অধ্যাপক মর্লির কাছে সাহিত্য বিষয়ক বহুগ্রন্থ পাঠ করেছিলেন, তার মধ্যে শেক্সপীয়রের Coriolanus এবং স্যার টমাস ব্রাউনের Urn Burial এর নাম পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যে কত বিষয়ের সংগে পরিচিত হয়েছিলেন এবং কত বিষয়ের গ্রন্থ তাঁর পুস্তকাধারে রক্ষিত থাকত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় Rabindranath Tagore প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন। বেদ, উপনিষদ থেকে বাইবেল ও লালন শাহের জীবনী তাঁর টেবিলে সর্বদা থাকত। আমরণ জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর ছিল অসীম উৎসাহ : তীব্র শীতের রাত্রিতে লণ্ডনের ষ্টেশনে গাড়ী হারিয়ে আর এক গাড়ীর অপেক্ষায় বসে না থেকে রবীন্দ্রনাথ স্পেন্সরের সদ্য প্রকাশিত Data of Ethics গ্রন্থ পড়া শুরু করেন। তাঁর প্রবন্ধমূলক রচনাগুলি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে — রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানের পরিধিকে মোটামুটি ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে কয়েকটি সত্যে দৃষ্টি সংযোগ করা যায়। প্রথম, তাঁর জ্ঞানার্জনের মধ্যে বাল্যকাল থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-বিষয়ক-জ্ঞানের একটি ভারসাম্য ছিল। প্রাচীনকাব্য যেমন পড়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনকেও আয়ত্ত করেছেন। ফলে উভয় দেশীয় সাহিত্যরুচি ও শিল্পদৃষ্টির একটি আন্তরিক সংযোগ রবীন্দ্রমানসে সংঘটিত হয়েছিল। এর জন্যে ভাবনারাজ্যে ইউরোপীয় রেনেসাঁস উদ্ভূত নব্য কাব্য চিন্তা, সৌন্দর্য জিজ্ঞাসাকে স্বদেশীয় কাব্য চিন্তার সংগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন। বাঁর্গসর গতিবাদের সংগে উপনিষদের গতিবাদের সমন্বয় সাধন তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। তাঁর সমন্বয়বাদী শিল্পদৃষ্টির মূলসূত্র এই ব্যক্তি শিক্ষার গভীরে নিহিত।

৩. ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকালে বহু মনীষীর বিচিত্র ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেছেন। একাধারে অনেকের ব্যক্তিত্ব দ্বারা তিনি যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি বহু চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণও করেছেন। বাল্যকালে শ্রীকণ্ঠবাবুর উদার, দয়ার্দ্র এবং কোমল হৃদয় তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তা সশ্রদ্ধ ভাবে স্বীকার করেছেন।[৫৯] তাঁর সঙ্গীতানুরাগে শ্রীকণ্ঠবাবুর দান সুদূর প্রসারী। রবীন্দ্র-নাথের উপন্যাসে বিপ্লব, বসন্তরায়, চন্দ্রনাথবাবু, পরেশবাবু প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যদিয়ে

তাঁকেই যেন ছায়াসম্পাত করেছেন। সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনাকালে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের চিন্তা ও উৎসাহ উল্লেখযোগ্য। তবে রবীন্দ্রনাথের মানস-গঠনে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভ্রাতাদের পরে যাঁদের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ তাঁরা হচ্ছেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, কৃষ্ণবিহারী সেন, বিহারীলাল, বিদ্যাসাগর, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও লোকেন পালিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্য মজলিসের মধ্যমণি ছিলেন অক্ষয় চৌধুরী। ইংরাজি সাহিত্যে তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় তিনি সে যুগের আধুনিক ইংরাজি কবিতা বাংলা ছন্দে ও ভাষায় অনুবাদ করতে সমর্থ হন। এঁরই কাছে তিনি মূরের Irish Melodies ও বালক কবি চ্যাটার্টন সম্বন্ধে তথ্য জানেন। ১২৮২ সালের কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথ এঁর সংস্পর্শে আসেন। এই সূত্রে বিহারীলাল চক্রবর্তীর সান্নিধ্যেও আসেন। একই সময়ে শেক্স্‌পীয়ারের অনুবাদ নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পরে বাংলা শব্দ তত্ত্বের উন্নয়ন-সংস্থা গঠনের জন্য বাঙলার হিউমানিষ্ট পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বহুবার তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পত্রিকার লেখা সংগ্রহের তাগিদে তাঁকেই কলকাতার কবি লেখক মহলে ঘুরাঘুরি করতে হত। ফলে তদ্‌কালীন সমস্ত সাহিত্যিক কবিদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতা ঘটে। এটা 'ভারতীর' প্রকাশ কাল (১৮৭৭ জুলাই)।

বিদ্যাসাগর যেমন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথের গুরু, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রও তেমনি অ-পাঠ্য গ্রন্থের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রমনশ্চর্চার গুরু। সাহিত্য সভায় যোগদানের অনুরোধ করতে যেয়ে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়; সেই প্রথম পরিচয়েই বিখ্যাত পণ্ডিত ও কৌশলী বাগ্মীর ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরিচয়ের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই রাজেন্দ্রলালের কাছে যখন তখন যেতেন।[৬০] বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্বের পথ প্রদর্শক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। প্রাচীন ভারতের প্রতি তাঁর যে সজাগ কৌতুহল ছিল তা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে পরিচ্ছন্ন ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁর খাঁটি শিষ্য যদি কেউ থাকেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর রাজা, অচলায়তন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা প্রভৃতির মধ্যে ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রভাব ও অনুপ্রেরণা সহজেই অনুমেয়।

এরপর আমেদাবাদ প্রবাস কালে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি কথোপকথন শিক্ষার জন্য নিযুক্ত এক অসাধারণ সুন্দরী বিদুষী আন্না তরখড়-এর সান্নিধ্যে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কবি-কাহিনী' কাব্য খানির ইংরাজি তর্জমা করে তাকে শুনাতেন। বিলাত প্রবাস কালে তিনি হেন্‌রি মর্লির সাহচর্যে আসেন—তিনি ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। লোকেন পালিতের সঙ্গে পরিচয় তাঁর ইংরাজি সাহিত্য ও আচার-আচরণ

জানার অনুপন্থী হয়েছিল। লোকেন পালিত ইংরাজি সাহিত্যে উৎসাহী ছিলেন।[৬১]

কর্মজীবনে রবীন্দ্রনাথ বহু উল্লেখযোগ্য, সশ্রদ্ধ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের নাম এবং তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সম্পর্কের পরিচয় পেলেই একথা সুস্পষ্ট হয়—কেমন করে, কোন্ শক্তিতে তিনি আজীবন বিশ্বমানব কল্যানের প্রয়াসে সমন্বয়বাদী হতে পেরেছিলেন—কি ধর্মের প্রশ্নে, কি সাহিত্যাদর্শের ক্ষেত্রে কিংবা বৃহৎ আন্তর্জাতিক চিন্তা-বৈচিত্র্যের ঐক্য সাধনের প্রশ্নে। প্রথম জীবনে ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁকে স্নেহ করতেন। পরবর্তীকালে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যদুনাথ সরকার, অক্ষয়কুমার মৈত্র, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ ভাণ্ডারকার—এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদ্যতা এবং এঁদের মধ্যে নানা কাজে পারস্পরিক সহায়তার কথা অনেকেরই জানা আছে।

সেকালের বহু প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী—ডঃ মেঘনাথ সাহা, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ এবং জগদীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সবিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। জগদীশ চন্দ্রের বিদেশ প্রবাসের অর্থ সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথ নিজেই করতেন। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ জগদীশ চন্দ্রকে লিখেছিলেন :[৬২]

> যে অগ্নি তুমি পাইয়াছ ··· তাহা ভারতবর্ষের হৃদয়াগারে স্থায়ী করিয়া যাইতে হইবে। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি।

এগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়—উক্ত বিজ্ঞানী-প্রতিভার এবং প্রবণতার স্পর্শে রবীন্দ্রমানস বিজ্ঞানের প্রেরণায় **সমৃদ্ধ হয়ে ভাব এবং বস্তুলোকের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন।** বিজ্ঞানের যোগে কবির ধর্ম হয়ে উঠেছে বিচার সহ, সংস্কারবর্জিত এবং সর্বসাধারণমুখী। 'এছাড়া সুহৃদ ডঃ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র শীল, রাধাকৃষ্ণণ ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং দার্শনিক-প্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি দার্শনিক তাঁর ভাবলোকে প্রভাব বিস্তার করেন'।[৬৩] রবীন্দ্রচিন্তার একটি দার্শনিক সিদ্ধান্তের জন্য তাঁদের সান্নিধ্য উপেক্ষণীয় নয়।

৪· সমাজ পরিবেশ : স্বদেশ-বিদেশ।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সরকারী তোষণ-নীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটল। পক্ষান্তরে ধনবাদী সমাজের মূলশক্তি মূলধন সঞ্চয়ের কাজও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। ফলে ইংরেজ উপনিবেশবাদী

শাসননীতির সংকীর্ণতা তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। সাধারণ জনসমাজের (বিশেষভাবে কৃষক শ্রেণীর) ইংরেজ বিরোধীনীতির প্রকাশ ইতিমধ্যে বিভিন্ন হাঙ্গামা — যেমন পাগ্‌লা বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সন্ন্যাস বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদির মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এ সময় শিক্ষিত শ্রেণী দেশানুরাগ জাগিয়ে তোলার জন্য নতুন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করল। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রচারে প্রায় ষাট বছর অতিক্রান্ত হল। এই দীর্ঘ প্রচার কর্মের ফল হল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতি। অপরদিকে উল্লিখিত বিভিন্ন বিদ্রোহ এ-পর্যায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে জোগাল প্রেরণা। এই দুই ধারার প্রভাবেই শেষ পর্যন্ত বাঙ্‌লা দেশে গড়ে উঠেছিল সংস্কারপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন।[৬৪]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা দেশের স্বাদেশিকতার নবরূপায়ণের ক্ষেত্রটি গড়ে ওঠে বিশেষভাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁরা সকলেই ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারমূলক আন্দোলন ও হিন্দুমেলার (১২৭৩ সাল) উদ্বোধন এবং কার্যপ্রণালীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন ঘনিষ্ট ভাবে।

অতি তরুণ বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশপ্রেম, জাতীয়তা এবং স্বাদেশিকতা যা তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (১৮৪০), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩) কে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আবর্তিত হয়েছিল ; যা বাঙালীর চিন্তাধারণার অন্যতম ধারক ছিল — সেই কর্মচেতনার রক্তবীজ রবীন্দ্রমানসে অঙ্কুরিত হয়েছিল বাল্যকাল থেকেই।

১২৭৩ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিন (১৮৬৭) বেলগাছিয়ার ডন্‌কিন্ সাহেবের বাগানে হিন্দু মেলার উদ্বোধন হয়। নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মেলার সূত্রপাত করেন। অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজনারায়ণ বসু ছিলেন প্রধান। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বদেশী-মেলা' বলেই এর উল্লেখ করেছেন।[৬৫] এ-সময়ে আর্য্যদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে মাৎসিনীর বিপ্লবী জীবনী প্রকাশিত হত (১৮৬৫—৭২)। এরই বিপ্লবী প্রেরণা পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদে প্রেরণা জুগিয়েছিল। 'কার্বোনারী' নামে গুপ্ত সংস্থার অনুকরণে ঠনঠনিয়ার এক পোড়োবাড়ীতে 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটা গুপ্ত সংস্থা (হাম্‌চু পামুহাফ) স্থাপিত হয়। এর মূলে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং

রাজনারায়ণ বসু। চোদ্দ-বছর-প্রায় বালক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর সভ্য ছিলেন।[৬৬] প্রভাত মুখোপাধ্যায় মনে করেন :

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন

গানটি এই সভার জন্যই বালক-কবি রচনা করেছিলেন। হিন্দু মেলার দশম-বার্ষিক উৎসবে (১৮৭৭ ফেব্রুয়ারী)[৬৭] রবীন্দ্রনাথ একটি জ্বালাময়ী কবিতা পাঠ করেন। দুর্ভিক্ষ-আক্রান্ত শশ্মান-প্রায় দিল্লীতে বড়লাট লীটনের আড়ম্বরের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদ উৎসারিত হয়েছে কবিতাটির মধ্যে। এর পরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭৮) ব্যারিষ্টারি পড়ার উদ্দেশে আমেদাবাদ হয়ে ইংলণ্ড রওনা হন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে (১৮৭৭ সেপ্টেম্বর ২০) বিলাত চললেন। ব্রিন্দিসি বন্দরে নেমে রেলপথে প্যারীস হয়ে ইংলণ্ড পৌঁছান। বিপুল পৃথিবীর বিচিত্র মানবগোষ্ঠী রবীন্দ্রমানসে নতুন প্রবর্তনা আনল। বাল্যকালের পিতৃমুখে শ্রুত উপনিষদের বিশ্ব-ব্যাপ্ত হওয়ার সত্য প্রত্যক্ষ করলেন এই প্রথম। সারাজীবন বিশ্বমানব তাঁকে আহ্বান করে ঘর-ছাড়া করেছে — তাদের সান্নিধ্য-স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের জীবনচর্চা পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। বিলাতে রবীন্দ্রনাথ ব্রাইটন শহরের ব্রাইটন পাব্‌লিক স্কুলে ভর্তি হলেন। ইংলণ্ডীয় সমাজের সঙ্গে তিনি গভীর ভাবে একাত্ম হন। এখানে নাচের সভায় বিলাতী নাচে দীক্ষা নেন, ইংরাজি গানের স্কুলেও ভর্তি হন।[৬৮] অতঃপর তারকানাথ পালিত তাঁকে লণ্ডন য়ুনুভার্সিটি কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন। এখানে লোকেন পালিত ও হেন্‌রি মর্লির সঙ্গে পরিচয় হয়। গুরু হিসাবে মর্লিকে পেয়ে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আন্তরিক হন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে যাবার পথে প্যারিস এক্‌জিবিশন দেখেন। চিত্রশালায় অসংখ্য ছবি, প্রস্তরমূর্তি ও দেশবিদেশের নানান জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে নারী সমাজের স্বাধীনতার মধ্যে মনুষ্যত্বের বিজয় লক্ষ্য করেন। 'ভারতীর' পত্র-প্রবন্ধগুলিতে, বিলাতের নারী সাতন্ত্র্য ও নরনারীর অবাধ মেলামেশার মহত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুকুল অভিমত অকুণ্ঠিত লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে।[৬৯] উনিশ বছর বয়সে তিনি ভারত প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বদেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ নাট্যমঞ্চায়ণে এবং কবিতা-উপন্যাস রচনাতে মনোনিবেশ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তিনি জড়িত

হন। এ সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ পণ্ডিতেরা হিন্দু ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলে কতকগুলি আজগুবি মতামত অর্ধশিক্ষিত লোকেদের বুঝিয়েছিলেন। তাঁদের প্রতিপাদ্য ছিল যে, সমাজ প্রচলিত সমুদয় আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কার বিজ্ঞানসম্মত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষী অজ্ঞেয়বাদী কোঁতের কল্যাণধর্মকে হিন্দুধর্মের আদর্শ বলে প্রচার করেছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু সে যুগের বিশিষ্ট চিন্তাশীল ও ক্ষমতাবান লেখক। এঁরা সকলেই ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধী, ও হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যাকার্যে এবং সমর্থনে উদ্‌গ্রীব। 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকা দুটি ছিল তাঁদের মুখপত্র। উক্ত পত্রিকার কয়েকটি প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন; তিনি নিজেই হলেন আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক। এর পর থেকে রবীন্দ্রমানস সামাজিক পরিবেশ থেকে যত না নিয়েছে উপাদান, তার চেয়ে অধিক করেছে লক্ষ্য নির্দেশ। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী তদারকের সুযোগে গ্রামীণ সাধারণ-মানুষের সান্নিধ্যে আসেন, গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের এই প্রত্যক্ষ পরিচিতি পরবর্তীকালে তাঁর মানসিকতাকে লোকায়িত করতে সাহায্য করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ-তৃষ্ণা তাঁর উত্তরাধিকার। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল আরো গভীর, তিনি ছিলেন বিশ্বমানবিক। রেনেসাঁসের মানববাদী রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিশিক্ষা আর বোধের অপরিসীম গভীরতায়, অনুভূতির তীব্রতায় সর্বমানবিক হয়েছিলেন। জীবনের শেষদশক পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ করেছেন, পৃথিবীর জীবন-দর্শনকে প্রয়োজন বোধে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত এবং স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিদেশ ভ্রমণ মানস-গঠনে কয়েকটি মৌলিক উপাদান জুগিয়েছে। ১৮৯০ এর ২২শে আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ তিন মাসের জন্য বিলাত যান। এবার তিনি 'স্যাভায় থিয়েটারে' গণ্ডোলিয়র্স গীতিনাট্য 'লাইসীয়ম নাট্যশালায়' স্কটের ব্রাইড অব লামারমূর থেকে শুরু করে — এক্‌জিবিশনে কারোলু ডুঁরোর চিত্র পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি এবার ইংলণ্ড সম্পর্কে অতি বাস্তব সত্য-দৃষ্টি নিয়ে আসেন।

> বলতে লজ্জাবোধ হয়, আমার এখানে ভাল লাগছেনা। সেটা গর্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয় — আমার স্বভাবের ত্রুটি। ··· তিনমাস, ছ-মাস কিংবা ছ-বৎসর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাত পা নাড়া দেখতে পাই মাত্র। ··· কিন্তু এখানে এসে দেখি কেবল ইংরেজ বিদেশী, তাদের চালচলন ধরণ-ধারণ যা কিছু নূতন সেইটেই কেবল ক্রমিক চক্ষে পড়ে

যা চিরকেলে পুরাতন ঢাকা পড়ে থাকে, সেই জন্যে এদের সঙ্গে কেবল পরিচয় হ'তে থাকে কিন্তু প্রণয় হয়না।

রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে ১৯১২ মে ২৭, বিলাত যান। এবার বিলাত গমন সাহিত্য চিন্তার পরে ব্যাপক বিদেশী প্রতিভার স্পর্শ লাগে। রোদেন ষ্টাইন, য়েট্স্, মেসফিল্ড, আর.নেসট্রিস, মিস সিনক্লেয়ার, আওার হিল, এজরা পাউণ্ড, ওয়েল্স্, বার্নাড'শ, লোয়েস, ডিকিন্সন, ব্রাট্রাণ্ড রাসেল, জন গলসওয়ার্দি, রবার্ট ব্রিজ প্রভৃতি মনীষীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা হয়। এজরা পাউণ্ড এবং য়েট্সের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা সকলেরই সুবিদিত।[৭১] এখানেই রেভারেণ্ড সি. এফ. এন্‌ড্রুজের সঙ্গে পরিচয়।[৭২] উল্লিখিত বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করা যায়।

ক. উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের জাতীয়তাবাদী ও স্বাদেশিকতা যেমন তিনি পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তপ্রবাহ ও ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে, পত্র-পত্রিকা নাটক থেকে পেয়ে ছিলেন, তেমনি দ্বিতীয়ার্ধের উল্লেখযোগ্য সংগঠন সঞ্জীবনী সভা, 'হিন্দুমেলা'র সঙ্গে জড়িত হয়ে স্বাদেশিকতার দীক্ষাও নিয়েছিলেন। সর্বোপরি রেনেসাঁসের মানবিকতা তিনি সমাজ পরিবেশ থেকে গ্রহণ করতে সক্ষম হন। অপর পক্ষে তীব্র মানবকল্যাণবোধ যখন 'হিন্দুমেলার উপহার', 'লীটনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে' উৎসারিত হচ্ছে তখন তিনি বিলেত যান। তথাকার সমাজ এবং মানুষের সংস্পর্শে এসে তিনি ইউরোপের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আন্তরিকতা অনুভব করেন। ফলে, রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা, স্বদেশ প্রেম, ও দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের খাতে প্রবাহিত হতে পারেনি। স্বদেশ ও বিদেশে ভ্রমণ, বিশ্বমানবের সঙ্গে পরিচয় তাঁকে সর্বমানবিক-বোধে উজ্জীবিত করতে প্রত্যক্ষ সহায়তা করেছে।

খ. বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারী দেখতে যেয়ে বাঙলার জনসাধারণের সঙ্গে গভীর ভাবে মিশবার সুযোগ পান। এখানে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের হৃদ্যতা তাকে একটি বিশ্বাস জন্মিয়েছিল যে স্বাধীনতা আর মুক্তিকল্যাণ কেবল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য নয় দরিদ্র ভারতীয় মানুষের জন্য। যেমন সে কল্যাণ য়ুরোপীয় দরিদ্র মানুষের জন্যও বটে। এ বিশ্বাস তাঁর উপনিষদের দীক্ষা কেবল নয়, এ বোধ রেনেসাঁসের ; এ বোধ রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষজীবন-অভিজ্ঞতার কেন্দ্রভূমি

থেকে উৎসারিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বাংলার সাধারণ মানুষের সান্নিধ্য এবং আজীবন পৃথিবীর মানুষের সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন, উনিশ শতকের কোন রাজনৈতিক নেতাও সাধারণ জনসাধারণের সঙ্গে তেমন ভাবে আন্তরিক হতে পারেন নি। কারণ সে রাজনীতি ছিল শিক্ষিত ধনিক ও উচ্চমধ্যবিত্তের রাজনীতি এবং মুক্তি কামনা।

গ. দেশীয় প্রবর্তনা, স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তা যে সময় রবীন্দ্রনাথকে উদ্বেলিত করেছে ঠিক সে সময় তিনি পৃথিবীর সংস্পর্শে, সেদেশের মানুষকেও আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং একটি সমন্বয়ের প্রশ্ন তাঁর সম্মুখে এসেছে।

ঘ. পুনঃ পুনঃ বিদেশ ভ্রমণ বিদেশী সমাজসত্য, এবং মানসিকতাকে উপলব্ধির সাহায্য করেছিল। যার জন্য তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার মূলীভূত আদর্শকে ধারণ করে মৌলিক ত্রুটিকে নির্দেশ করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যে পাশ্চাত্য সমাজরীতির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, সে দৃষ্টি তপোবনের ঋষি দৃষ্টি নয় — বরং প্রত্যক্ষ এবং পুস্তকের পরোক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত।

৪

রবীন্দ্রমানসের স্বরূপ-নির্দেশের পূর্বাহ্ণেই বলা উচিত তিনি রাজনীতিবীদ ছিলেন না, সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, এমনকি কোন অভিনব দর্শনের প্রচারও তাঁর কামনা-লক্ষ্য ছিল না। তিনি ছিলেন মূলতঃ জীবন-স্রষ্টা, — মানবপ্রেমিক সাহিত্য-কর্মী। জীবনদৃষ্টির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, মাইকেলের উত্তরাধিকারী হিউম্যানিষ্ট। এই মানবতাই—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যুগানুগ পরিবেশ ও ঐতিহ্য সূত্রে পেয়েছিলেন এবং ব্যক্তিশিক্ষা এবং সমাজ-অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপ্ত করেছিলেন। সুকুমার সেন কথিত আত্মপ্রসারের যুগ[৭৩] বলে রবীন্দ্রকালকে নির্দেশ করার সার্থকতা এই সূত্রে সত্য। রবীন্দ্রমানসের বৈশিষ্ট্যের প্রধান সত্য হল তার সমন্বয়বাদী মানসিকতা। রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী ছিলেন নিঃসন্দেহে—তবে বিশ্বমানব কল্যাণের প্রয়োজনেই তিনি জীবনবাদী, বাস্তববাদী হয়েছিলেন। যখন তিনি রাশিয়ায় যেয়ে বিমুগ্ধ হন, তার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেন ; জালিয়ানাবাগের হত্যার প্রতিবাদে 'নাইট উপাধি' পরিত্যাগ করেন ; বিজ্ঞানের

চর্চার জন্য উৎসাহী হন, জগদীশচন্দ্রের অর্থভার গ্রহণ করেন, নোগুচিকে প্রত্যাখ্যান করেন ; এবং রাথবোর্ণের চিঠির রূঢ় জবাব দেন, য়ুরোপীয় সভ্যতার জড়বাদী, অতিভোগবাদী মনের প্রতিবাদ করে তার সভ্যতার পতনের ভবিষ্যতবাণী করেন ; চীনের জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান ; নিপীড়িত আফ্রিকার জন্য যন্ত্রণা অনুভব করেন ; পক্ষান্তরে ভারতীয় জীবনের তীব্র সমালোচনা করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বটুকু গ্রহণ করেন, মানুষগড়ার যন্ত্র হিসাবে 'তপোবন পদ্ধতির' বিদ্যালয় স্থাপন করেন, গ্রামে কৃষিঋণ ব্যাঙ্ক করেন—বারবার বিদেশে যেয়ে বিশ্বমানবতার জন্য বক্তৃতা করেন—তখনি রবীন্দ্র-মানসে আপাতঃ বৈপরীত্য অনেকে সন্ধান করেন — কিন্তু এই বিচিত্র মানসিকতা উৎসারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী অথচ একক মানবিকতাবোধ থেকে। বিশ্বমানবের ঐক্যের জন্য তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয় প্রত্যাশা করেছেন ; ন্যাশনাল-ইজমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছেন ; — বিশ্বমানবের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় ধনবাদী, সাম্রাজ্যবাদী প্রবৃত্তির ঘৃণা করেছেন।

এই মানব-কল্যাণ-বোধের জন্যই রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেন নি ; জন-সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন স্বদেশী আন্দোলনের বয়কটনীতির নিষ্ঠুরতাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর সুবিধাবাদী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল জনসমাজের প্রতি অবহেলা — সে কর্তব্য বরং সংগঠনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্দেশ্যবাদী রাজনীতিবীদ না হওয়ায় তিনি পরিচ্ছন্ন ভাবে তাদের ত্রুটি নির্দেশ করতে পেরেছিলেন। Nationalism এর বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিষ্টরূপ দেখে তিনি যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদ বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন। এই কারণে তৎকালীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণ রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝেছিলেন। কোন কোন সমালোচক তাঁকে ভাববাদী বলে উপেক্ষা করেছিলেন ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদ বিরোধী আন্দোলন — স্বাদেশিকতাকে অস্বীকার করে নয়।

ধর্মবোধের প্রশ্নে তিনি উপনিষদের প্রবর্তনা নিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু উপনিষদের কাছ থেকে তিনি অধিক পেয়েছিলেন সৌন্দর্যবোধ। তাঁর ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনার সুগভীরে প্রবেশ করার কোন প্রয়োজন এ প্রবন্ধে নেই। ধর্মের দুটি দিক ক. আচার, খ. কল্যাণ। বিশ্বমানবতার ঐক্যের অন্তরায় আচারকে উপেক্ষা করে সারসত্য কল্যাণ-বোধকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মের নামে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

> আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে—আমি সমগ্রকেই মানি, গাছ যেমন আকাশের আলো থেকে আরম্ভ করে মাটির তলা

> পর্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতু-পর্যায়ের বিচিত্র প্রেরণা দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ করে তবেই সফল হয়ে ওঠে—আমি মনে করি আমারও ধর্ম তেমনি—সমস্তের মধ্যে সহজ সঞ্চরণ করে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শলাভ করে সার্থক হতে পারবে।[৭৪]

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কোন শাস্ত্রতত্ত্বের সারকথা নয়, তাঁর ধর্ম মানুষের ধর্মের আন্তর্জাতিকতা, চিরন্তনতা। তাঁর ধর্মবোধে তাই ইসলাম, খৃষ্ট, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, সুফী, বাউল-দর্শন এবং সর্বোপরি উপনিষদের কল্যাণ-সত্য সমন্বিত হয়েছে। বলাবাহুল্য উক্ত সমন্বয় সাধিত হয়েছে বিশ্বমানবের কল্যাণ ও ঐক্যের অনুপন্থী হিসাবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্তমান-ভারতের পশ্চাদ্‌গামিতার কারণ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে — বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মূলসত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা হচ্ছে গতিশীলতা।[৭৫] অর্থাৎ পুরাতনের গর্ভে নূতনের অভ্যুদয় এবং সমাজ-ব্যবস্থার অনিত্যতা। এই বিশ্বাস তাকে প্রগতিবাদী করেছে। এই সত্যের দিকে লক্ষ্য না করে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা অনুধাবনের চেষ্টা করলে — আমরা বহুবিধ বৈপরীত্যের সম্মুখীন হবো; এবং বিভ্রান্তই হবো সমোধিক। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রশংসা এবং পরবর্তীকালের তীব্র নিন্দার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্ঞানের আপেক্ষিকতার প্রশ্ন নেই, বরং সমাজবিবর্তনের ইতিহাসে ইউরোপের প্রাপ্য গৌরব এবং অশ্রদ্ধাই তিনি ইউরোপকে দিয়েছেন।

উক্ত সর্বাস্তিবাদ রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন এবং এই দর্শনই তাঁকে পরিচালনা করেছে শিল্পদৃষ্টির কাজে। রবীন্দ্রনাথের এই সর্বাস্তিবাদ জীবনদর্শনের মধ্যে ভাববাদ এবং বাস্তববাদের দ্বন্দ্ব বর্তমান। এই দ্বন্দ্ব-মিলনই রবীন্দ্রিকশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনপ্রেরণা বিশ্বমানবমুখী বলেই তাঁর জীবনদর্শন ভারসাম্য হারিয়ে আকাশচারী হতে পারেনি। মানবপ্রেম তাঁকে সঠিক লক্ষ্য নির্দেশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু তত্ত্বের সাহায্যে যখনই সত্যাসত্যের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গেছেন তখনই ভুল করেছেন, এবং সে ভুল শুধরে নিয়েছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে। ভুলের, গৃহীত-এককালীন-সিদ্ধান্তের সংশোধনই রবীন্দ্রপ্রতিভার গৌরব। এ সম্ভব হয়েছিল জীবনের চলিষ্ণুতা সম্পর্কে তাঁর তীব্র সচেতনতার জন্যে। ফলত, ভারতীয় রাজনীতিকগণ যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও ধনিক সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত, রবীন্দ্রনাথ তখন রাশিয়ার কৃষক-শ্রমিকের মানবিক প্রতিষ্ঠার প্রতি অকুন্ঠ সমর্থন জানাতে পেরেছিলেন। লিখতে পেরেছেন রথের রশির (৩১ ভাদ্র ১৩৩৯) গণজাগরণের উক্তি ঃ

আজকের মতো বলো সবাই মিলে —
যারা এতদিন মরেছিল তাঁরা উঠুক বেঁচে
যারা যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

এখানে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান বড় কথা নয়, নতুন যুগে শূদ্রের বা ক্ষুদ্রের (workers) দিন আগত, তারাই সমাজকে চালনা করবে।

ধনবাদী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি-কর্মের সূচনা, অথচ তিনি যে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছাতে পেরেছিলেন, এর অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের কোন বিশিষ্ট রাজনীতি-সচেতনতা বা দর্শনকার্যকরী ছিল না, সক্রিয় ছিল তাঁর জীবনাদর্শে সর্বগ্রাহী বিশ্বমানবতাবাদ। এই মানবতাবাদই রবীন্দ্র-নাথের সবসৃষ্টির নিয়ন্ত্রণী শক্তি ছিল; ছিল তাঁর ভাববাদ ও বস্তুবাদের, ব্যক্তিবাদের ও সমাজবাদের, ধর্মতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সকল দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্ব অবসানের সেতু স্বরূপ।

৫

বস্তুত, রেনেসাঁস-উত্তর মর্ত্যপ্রীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, সৌন্দর্যপিপাসা এবং সর্বোপরি বিশ্বমানবিকতাবোধের যোগফল রবীন্দ্রমানস। উক্ত সামগ্রিক প্রবণতার পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রপ্রতিভা লালিত এবং বর্ধিত হয়েছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য-রীতির সমন্বিত শিল্পবোধ রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বে পরিশ্রুত হয়ে উৎসারিত হয়েছিল। যার দুর্লভ বৈশিষ্ট্য হল যুগানুসারী গতিশীলতা। সর্তক দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-উপন্যাস পাঠ করলে স্পষ্ট হবে যে ঃ বিনোদিনীর জীবনতৃষ্ণা, দামিনীর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার যন্ত্রণা, নীরজার নির্মম অধিকারবোধ, কুমুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরাজয় এবং উদয়াদীত্য বসন্তরায়ের প্রত্যাশার অপমৃত্যুর কার্যকারণসূত্র স্রষ্টা-মানসের মর্ত্যপ্রীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ, মানবিকতা এবং বিশ শতকের বিপন্ন-প্রায় অস্তিত্ব রক্ষার সংঘর্ষ ও সংগ্রামের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীলতা থেকে উৎসারিত। গোরার আন্তর্জাতিক চেতনায় অনু-প্রবেশ ও আত্মমুক্তি সংঘটন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিক ও আন্তর্জাতিক মনের শৈল্পিক সাক্ষ্য। পক্ষান্তরে, চলিষ্ণুতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতাই তাঁকে শিল্পক্ষেত্রে নিরীক্ষাবাদী স্রষ্টা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। করুণার রবীন্দ্রনাথ তাই অত্যাশ্চর্য ভাবে শেষের কবিতা চার অধ্যায়ে অতিক্রমণ করতে পেরেছেন। রবীন্দ্রমানসের, পুংখানুপুংখ বীক্ষণ শেষে যে কোন সতর্ক সমালোচক একমত হবেন যে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, কি ভাবে কি প্রকাশরীতিতে, রবীন্দ্রমানসের প্রবণতা এবং তাঁর জীবনার্থ ও পুরুষার্থের রূপান্বিত রূপক।

৩. রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ দেশ-কাল

১

দেশ-কাল কথাটার স্বতন্ত্র অর্থ যাই হোক না কোন, সাহিত্যে এর একটি পৃথক তাৎপর্য রয়েছে। একথা সত্য যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য সব কিছুই মনোজগতের সামগ্রী। কিন্তু মনোজগত বস্তু-জগত সম্পর্কহীন বিশেষ কোন বায়বীয় (abstract) পদার্থ নয়। সে শূন্যের মধ্যে ক্রিয়া করতে পারে না। মানুষের মনোলোকের যে কোন ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ার জন্যেই, বস্তুলোকের অভিঘাত প্রয়োজন। তেমনি যে কোন স্রষ্টারই সৃষ্টিকর্মের বস্তুলোক দেশ-কাল-পটভূমির উপর নির্ভরশীল। ফলে, সচেতন ভাবেই হোক আর আর অসচেতন ভাবেই হোক স্রষ্টার সমাজ, পারিপার্শ্বিকতা, তদ্‌কালীন ভাবলোক, চিন্তা-ধ্যানধারণা — ইত্যাদি তার নির্বাচিত বস্তুলোকের মধ্যে গৃহীত হয়। এই সব কিছু মিলিয়ে যে বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতা আমাদের বুদ্ধিলোকে সক্রিয় থাকে, তাকেই আমরা অন্যভাবে বলি যুগধর্ম।

এ-কথা যেমন সত্য যে ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তুতে বা গল্পাংশ, দৃশ্য, সংলাপ, অলংকারে দেশ-কাল প্রতিফলিত হয়, তার চেয়েও অধিকতর প্রামাণ্য যে, উক্ত যুগধর্মই ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ, জগতদর্শন এবং শিল্পবোধকে করে নিয়ন্ত্রণ। এম্‌নি করে দেশ-কাল আমাদের নিকট থেকে তার স্বীকৃতি আদায় করে নেয়, আমরা আপাতভাবে সে স্বীকৃতিকে স্বীকার করি, অনেক সময় হয়ত করিওনা। যুগধর্ম অর্থাৎ দেশ-কাল এভাবে আমাদের সমগ্র জীবনের 'অন্তর্যামিরূপে দেখা দেয় বলিয়া সে আমাদের সকল শিল্প-দৃষ্টিরও অন্তর্যামী'।[১] বস্তুত সাহিত্যের যুগধর্ম বলতে আমরা সমাজ-সত্য, দেশকাল এবং স্রষ্টার জীবনদর্শনকে সামগ্রিক ভাবে বুঝি। উপন্যাসে স্রষ্টার জীবনার্থের স্বরূপ নির্দেশের প্রশ্নে একাধারে আমাদের দেশ-কাল-বিধৃত সমাজ সত্য এবং তার প্রতি লেখকের দৃষ্টিকোনের ইঙ্গিত করতে হয়।

সাহিত্যে দেশ-কালের সত্য আমরা দুটি রূপে লক্ষ্য করে থাকি। ক. বাস্তব সত্য এবং খ. ভাব সত্য।[২] অর্থাৎ কোন উপন্যাসে দেশকাল-বিধৃত ঘটনা বা সমস্যা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়, কোন উপন্যাসে সমাজধৃত নানা প্রবণতা, ভাব-সত্য রূপে পরোক্ষ ভাবে স্থান লাভ করে। দ্বিতীয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাব্যধর্মী, এ উপাদানটি সাধারণতঃ স্রষ্টার মানসলোক অধিক আলোড়িত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, যে বাস্তব-চেতনা, পরাজয়ের যন্ত্রণা থেকে রোমান্টিকতার উদ্ভব — তার একটি রূপ আমরা লক্ষ্য করি বঙ্কিমের উপন্যাসে, পক্ষান্তরে ভিন্ন প্রবর্তনা এনেছে বিহারী-লালের কবিতায়। উক্ত পরাজয়, আশাভঙ্গের চেতনা এটা দেশ-কালের ভাবসত্য।

কোন সাহিত্য সৃষ্টিই দেশ-কালকে অস্বীকার করে সম্ভব নয়। বিশেষ-যুগধর্মের আবহাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্ভব, পরবর্তী কালে একই কারণে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন। জীবন-রূপায়ণ কখনোই সম্ভব নয়, যদি না ব্যক্তি জীবনকে দেশ-কালের অর্থাৎ সমাজের এবং রাষ্ট্রের বাস্তব-সত্য ও ভাব-সত্যের প্রেক্ষিতে সমগ্রতায় উপলব্ধি করা যায়।

২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস রচনাকাল ১৮৭৮ (করুনা)[৩] থেকে শুরু করে ১৯৩৪ (চার অধ্যায়)[৪] সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। উনবিংশ শতকের শেষার্ধের শুধু নয়, সমগ্র উনবিংশ শতকের এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী জীবনের আশা-নৈরাশ্য, সামাজিক আলোড়ন, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত, জীবন যন্ত্রণা, ধর্মীয় সংঘর্ষ, জীবন ও জাতীয় জীবনে স্থিরাদর্শ সন্ধানের রক্তমুখী সার্থক ও ব্যর্থ প্রয়াসের ক্ষত এবং উল্লাস রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সমগ্র উপন্যাসকে কোন একটি ক্রমপরিণতিতে চিহ্নিত করা যথেষ্ট চিন্তা-সাধ্য কাজ। চোখের বালির মত প্রথম বাংলা সার্থক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের পরে নৌকাডুবির মত ঘটনা প্রধান উপন্যা-সের আবির্ভাব, কিংবা যোগাযোগের ঐতিহাসিক প্রয়াসের পর চরম বুদ্ধি-প্রধান শেষের কবিতার সৃষ্টি — কোন কার্যকারণ-সুত্রে গ্রথিত করা যায় না। তেমনি রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেও কোন শ্রেণীকরণ সম্ভব নয়, দুইবোন-মালঞ্চের পরে 'চার অধ্যায়ে'র রাষ্ট্রিক প্রেক্ষিতকে কি দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলতে পারে?

সমালোচকগণ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করেছেন।[৫] তবে সুকুমার সেনের শ্রেণীকরণ অধিকতর যুক্তিসংগত। সুকুমার সেনের মতে ঃ

> ··· তৃতীয় স্তরে ব্যক্তির হৃদয়বৃত্তি ও মানসদ্বন্দ্ব জীবনের, ঘর-সংসারের বাহিরের বৃহত্তর ভূমিকায় উপস্থাপিত। এখানে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী সুস্পষ্টই ব্যক্তি হইয়াও যেন বিশেষ বিশেষ ভাবাদর্শের মূর্তিতে উপস্থাপিত। প্রেম সম্পর্কের প্রাধান্য থাকিলেও এখানে অন্য রসের যোগান আছে। কিন্তু সবার উপরে আছে সেই জিনিস যাহাকে বলিতে পারি বুদ্ধিরস। গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ এবং পরবর্তী সব উপন্যাস এই স্তরের অন্তর্গত।[৬]

কিন্তু গোরা, ঘরে-বাইরে এবং যোগাযোগের দেশ-কালের প্রেক্ষিতকে, শেষের কবিতা-দুইবোন-মালঞ্চে প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়। সেদিক দিয়ে গোরা থেকে শেষের কবিতা পর্যন্ত এক শ্রেণীতে নির্দিষ্ট করা যথেষ্ট যুক্তি সংগত নয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে, সুকুমার সেনের বক্তব্যকে স্বীকার করে সমগ্র রবীন্দ্র-উপন্যাসকে চারটি পর্যায়ে শ্রেণীকরণ করলে অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক হয় বলে আমাদের বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র উপন্যাসকে চারটি পর্যায়ে শ্রেণী-করণ করা চলে। প্রথম পর্যায়ে, হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এখানে অসংবেদনশীল ব্যক্তিত্বের চাপে ভাবমগ্ন কোমল চিত্তের দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভ প্রকাশিত। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত করুণা, বৌঠাকু-রানীর হাট ও রাজর্ষি এই পর্যায়ের উপন্যাস। দ্বিতীয় পর্যায়ে, প্রেম সম্পর্কেরই প্রাধান্য, আর যা কিছু রস আনুষঙ্গিক। বিশেষ অবস্থায় পতিত নর-নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং সংসারে সে আকর্ষণ-বিকর্ষণের জটিল প্রতিক্রিয়ার অনুসরণ মুখ্য উদ্দেশ্য। চোখের বালি ও নৌকাডুবি এই স্তরের রচনা। তৃতীয় পর্যায়ে, তাঁর উপন্যাসে আমরা দেশকাল-পটভূমিকে মানস-দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণার প্রেক্ষিত হিসাবে উপস্থাপিত হতে দেখি। গোরা-চতুরঙ্গ-ঘরে-বাইরে এবং যোগাযোগ এই স্তরের রচনা। চতুর্থ পর্যায়ে, নর নারীর প্রেম সম্পর্কের বিচিত্র লীলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিমিত হৃদয়াবেগ এবং নিয়ন্ত্রণী শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে বুদ্ধি-বৃত্তি। শেষের কবিতা, দুইবোন মালঞ্চ এবং চার অধ্যায় এই শ্রেণীর রচনা।

রবীন্দ্রমানস যেমন বৃহৎ কল্যাণ কামনায় নিত্য রূপান্তরশীল, তেমনি শিল্প প্রয়াসেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিরীক্ষাবাদী। কোন একটি বিশেষ প্যাটার্নে তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি, নব নব আবিষ্কারের উৎসাহ ও শিল্পপ্রেরণায় তিনি সাম্প্রতিক যুগ-ধর্মকে আলিঙ্গন করেছেন। যে আন্তরিক শিল্পপ্রেরণায় তিনি পদ্ধতি থেকে নবতর পদ্ধতিতে দুঃসাহসী অভিযান করেছিলেন, সেই শিল্প প্রেরণাই তার সৃষ্টি-ক্ষম-প্রজ্ঞাকে নিয়ন্তর ভবিষ্যতমুখী করেছিল এবং একারণেই, রবীন্দ্রনাথ সমকালীন পাশ্চাত্য উপন্যাস-রীতির অন্তর্গূঢ়

সত্যকে উত্তর-সাধকদের উত্তরাধিকার হিসাবে বাংলা উপন্যাসে সংযোজন করতে পেরেছিলেন।

৩

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস বৌঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩)[৭] এবং রাজর্ষি (১৮৮৭)[৮] ; কিন্তু রবীন্দ্রমানসের সম্যক পরিচয় লাভের জন্য পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত উপন্যাস করুণার আলোচনা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রকাব্যের অনেক সূত্র যেমন 'কবি কাহিনীর' মধ্যে নিহিত রয়েছে তেমনি কি শিল্প-দৃষ্টি প্রসংগে, কি যুগধর্মের প্রশ্নে — ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুরুত্ব-পূর্ণ মানস-লক্ষণ করুণার মধ্যে বিধৃত। এই স্তরের উপন্যাসের ভাবলোক প্রভাতসঙ্গীত এবং সন্ধ্যাসঙ্গীতের অনির্দেশ্য সৌন্দর্য ও হৃদয়ারণ্যের অস্ফুটতা দ্বারা আক্রান্ত।[৯] এ সিদ্ধান্ত যেমন শিল্পরূপের দিক দিয়ে সত্য, তেমনি ভাবমানসের দিক দিয়েও যথার্থ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পর্যায়ের উপন্যাস সম্পর্কে অনুৎসাহ প্রকাশ করেছেন।[১০]

উল্লিখিত উপন্যাস ত্রয়ের শিল্পমূল্য যাই থাকনা কেন, এর মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্র-মানসের জীবনার্থের ও শিল্প-দৃষ্টির মূল-সত্য প্রকাশিত হয়েছে, এবং পরবর্তীকালে পরিপক্ক ও পরিচ্ছন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তা সার্থকতা অর্জন করেছে।

অনেকে মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস যাত্রা বঙ্কিমচন্দ্রের চক্রবর্তী ছত্রছায়ায়।[১১] কিন্তু একথা যে বহুলাংশে সত্য নয়, তার প্রমাণ হবে যখন আমরা করুণা এবং বৌঠাকুরানীর হাট-রাজর্ষির মধ্যে নিহিত যুগধর্মের স্বরূপ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করব।

করুণার কাহিনী কোন ক্রমেই ঐতিহাসিক এবং রোমান্সধর্মী নয়। তাঁর মধ্যে নিহিত জীবনার্থও বঙ্কিমী নয়। শহরে পড়তে যেয়ে একদিনের আদর্শ ছেলে নরেন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল এবং তারই ফলে স্ত্রী কোমল হৃদয়া করুণার বিপর্যস্ত, দুঃখ ভারা-ক্রান্ত পরিণতি এর প্রতিপাদ্য বিষয়। উচ্ছৃঙ্খল এবং সৎজীবনের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে মহেন্দ্রের জীবনে। করুণার মধ্যেই যেন বিনয়, শ্রীনিবাসের অস্ফুট ছায়া লক্ষ্য করা যায়। করুণার মধ্যে প্রত্যক্ষ সমাজসত্য ঘটনারূপে প্রতিফলিত হয়েছে ; পক্ষান্তরে বৌঠাকুরানীর হাট-রাজর্ষিতে একই সমাজসত্য ভাব রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। সে ভাবরূপ হোল নিগূঢ় প্রেম-প্রীতি—সে প্রেম মর্তবাসী মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদার মধ্যে নিহিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রেমাণুরাগ যুগধর্মের আবহাওয়ায় বর্ধিত

এবং রবীন্দ্রনাথের মানস প্রস্তুত ; জনসমাজের জীবনের মধ্যে সে সত্য তখনও পরীক্ষিত হয়নি ; বাস্তবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তা পরিশ্রুত হয় নি। এই মানব প্রেম ও স্বাতন্ত্র্য-মর্যাদাবোধই রবীন্দ্রমানসের মূল প্রবর্তনা।

রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে বাঙলার রেনেসাঁস মোটামুটি চরিতার্থতা লাভ করেছে। বিদ্যাসাগরের জীবন কর্মের উৎস রেনেসাঁসের মূলধর্ম মানবতাবাদ বা মর্ত্যপ্রীতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসে স্বীকৃত হয়েছে। সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী সৌন্দর্য-প্রীতি, প্রেমপ্রীতি সর্বোপরি নারী-স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সরকারী আইনে বিধবা বিবাহ সমর্থিত হয়েছে। এই রেনেসাঁসের হাওয়ায় আজন্ম লালিত এবং স্বাতন্ত্র্য ক্ষমতার অধিকারী রবীন্দ্রমানস তীব্র ভাবে সৌন্দর্যানুরাগকে আলিঙ্গন করেছিল। এই সৌন্দর্য-প্রীতির মূল উৎস — মানব-প্রীতির মধ্যে নিহিত ; কারণ, জীবন রসই যখন মুখ্য রস হয়ে উঠল, তখন সৌন্দর্য পিপাসাই হয়ে উঠল ব্যক্তির জীবনের প্রধানতম চালনা শক্তি। রেনেসাঁস যুগের এই সৌন্দর্য চেতনা সম্পর্কে Legouis তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে বলেছেন ঃ

> The object of their transport was beauty, to which spenser addressed a magnificent hymn, and which Marlowe, in a famous passage and with poignant melancholy, declared to be behond complete expression ··· The generation lived in this fever.[১২]

এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যানুভূতি রেনেসাঁসের অসীম জীবন পিপাসারই অঙ্গ। এ জীবনাগ্রহের বর্ণনা করেছেন সেক্সপীয়র মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত Claudis-র মুখে Measure for Measure নাটকে।

> The Weariest and most loathed worldly life
> That age, ache, pencery, and imprisonment
> Can lay on nature, is a paradise
> To what we fear of death.[১৩]

এই মর্ত্য-প্রেমের সঙ্গে যে জীবন-প্রীতি ও সৌন্দর্য-প্রেম-প্রীতি জড়িত সেই প্রবর্তনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পেয়েছিলেন যুগধর্ম, ঐতিহ্য, ব্যক্তি শিক্ষার মাধ্যমে। এ স্তরের উপন্যাসে উক্ত যুগধর্ম কখনো প্রতীকে, ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রেক্ষিতে, কখনো বা প্রত্যক্ষ সমাজ পটভূমিতে স্থাপিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এর সূত্রপাত হয়েছে

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম রচনা প্রয়াসে। উল্লেখযোগ্য, এখানে তিনি প্রত্যক্ষ দেশ (Space) কাল (Time)-এ তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পেরেছেন।

ক

বাংলার গ্রামগুলি প্রাক্-বৃটিশ আমলে ছিল জগদ্দল পাথরের মত অচল, অনড়। মধ্যযুগের সুবিশাল কাল একই বৃত্তে আবর্তিত হয়েছে, কত বিদেশী আক্রমণ ও শাসন তাকে স্বীকার করতে হয়েছে — কিন্তু গ্রাম-মানুষের জীবন-যাত্রার কোনই পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ, এশিয়াটিক সমাজ ব্যবস্থার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি।[১৪] ইংরেজ শাসন গ্রাম্য সমাজের এই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিতে আঘাত করল। বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে গ্রাম্য সমাজ অর্থনীতির যোগাযোগ সৃষ্টি হতেই, দূর হোল স্বয়ংসম্পূর্ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা। এর একটি ফল হল, স্বতন্ত্র জনসমষ্টি সমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের ক্রমবর্ধমান তাগিদের উপলব্ধি; অন্যটি হল, আমাদের জীবন-যাত্রাকে গ্রামমুখিতা থেকে মুক্তি দিয়ে শহরমুখী করে তোলা।[১৫] এই অর্থনৈতিক মৌলিক পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন ভারতীয় সামন্ত-সমাজের অচলায়তন ধ্বসে গেল, জন্ম নিল ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রাথমিক অবস্থা। সচেতন ভাবেই হোক আর অসচেতন ভাবেই হোক, এই মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন সাধনই ইংরেজ শাসনের ঐতিহাসিক ভূমিকা।[১৬]

অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের ফলে সমাজ বিন্যাসেরও রূপান্তর হল। সৃষ্টি হল মধ্যবিত্ত সমাজ। সমাজের সেই শ্রেণীকে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে পারি, মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রধান নিয়ামক এবং মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রাথমিক উপাদান। ধনিক শিল্পপতি, শিক্ষিত চাকুরিজীবি ইত্যাদি যাদের জীবনের সঙ্গে মুদ্রার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, মুদ্রাই যাদের জীবনের মূলমন্ত্র, যাদের জীবন মুদ্রাসর্বস্ব, তারাই হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[১৭] সেদিক দিয়ে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব এং প্রতিষ্ঠা একটু স্বতন্ত্র। হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭) পূর্ব পর্যন্ত ভুমিস্বত্বের উপস্বত্ব — তালুকদারী, পত্তনিদারী, দর-পত্তনিদারী প্রভৃতি নানা উপসত্বের পরে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী দাঁড়িয়ে ওঠে। স্মরণযোগ্য ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিকাশের ইতিহাস এদেশে বৃটিশ পুঁজিপতিদের শিল্প বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে জড়িত।[১৮] সুতরাং শহর এলাকায় সৃষ্ট মুৎসদ্দি-বেনিয়ান, শ্রমিকশ্রেণী, ছোট ছোট ব্যবসায়ী ইত্যাদিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সরকারী চাকরিও পরবর্তীকালে

হয় এদের অন্যতম দ্বিতীয় আশ্রয়। ১৮১৭ এর পর থেকে উল্লিখিত শ্রেণীগুলি অর্থ-উপার্জনের প্রশ্নে শিক্ষা বা বিদ্যাকেই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শিক্ষিত শ্রেণীকে এক শ্রেণীভুক্ত করাই সঙ্গত, কারণ, বিদ্যাও নগদ মুদ্রা উপার্জনের উপাদান মাত্র। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলায় হিন্দু-মধ্যবিত্ত জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বিত্ত এবং বিদ্যা যখন সমাজ শাসনের অধিকার অর্জন করতে চলেছে, আভিজাত্য ও মর্যাদা যখন বিশেষ ভাবে বিদ্যার মধ্যেই কেন্দ্রিভূত হয়েছে— বিত্তশালীরাও তখন এদিকে সবিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এসময়ে সমাজাদর্শে, বিশেষত মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসে, নিদিষ্ট কোন লক্ষ্য নির্দেশ হয়নি। মধবিত্ত সমাজে বিচিত্র আলোড়ন, উচ্ছৃংখলতা, দ্বন্দ্ব, মানসিকতা ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছে। শহর কলকাতা তখন জীবনাগ্রহের যথার্থ এবং ভ্রান্ত পথের গোলক ধাঁধায় আবর্তিত।

উপরিল্লিখিত এবং আলোচিত দেশ-কালের পরিমণ্ডলে করুণার কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। গল্পের নায়ক নরেন্দ্র গ্রামের ছেলে। আশ্রয়দাতা ধনবান অনূপকুমারের ইচ্ছা তাকে 'ডিপুটি ম্যাজিষ্টর' করবে। সুতরাং:

> নরেন্দ্র ক্রমে কিছু বড়ো হইলে কলিকাতায় ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। কলিকাতার বাতাস লাগিয়া পল্লীগ্রামের বালকের কতকগুলি উৎকট রোগ জন্মিল।··· তখন দুই এক দিন অন্তর নরেন্দ্র বাড়িতে আসিত। কিন্তু এ আর সে নরেন্দ্র নহে। পানের পিকে ওষ্ঠাধর প্লাবিত করিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া, দুই পার্শের দুই সংগীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কন্‌ষ্টবল্‌দের ভীতিজনক যে নরেন্দ্র প্রদোষে কলিকাতার গলিতে গলিতে মারামারি খুঁজিয়া বেড়াইত, গাড়িতে ভদ্রলোক দেখিলে কদলীর অনুকরণে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিত, নিরীহ পান্থ বেচারিদিগের দেহে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নির্দোষীর মতো আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিত, এ সে নরেন্দ্র নহে — অতি নিরীহ, আসিয়াই অনূপকে টীপ, করিয়া প্রণাম করে।[১৯]

এই বর্ণনার সঙ্গে যে কোন সচেতন পাঠকই আলালের ঘরের দুলালের মতি-লালের চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন। গ্রাম্য একটি ভদ্র ছেলের কলিকাতা পরিবেশে বিভ্রান্ত হবার চিত্র, নিঃসন্দেহে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত সমাজের উচ্ছৃংখল দিকের সুস্পষ্ট প্রকাশ। এই নরেন্দ্রের সঙ্গে করুণার বিয়ে হয়, উচ্ছৃংখল নরেন্দ্রের অত্যাচারে কোমল স্বভাব, পতিপ্রাণ করুণার জীবনের ট্রাজিডি অঙ্কনই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দিষ্ট

শিল্পপ্রেরণা ছিল। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে এর লক্ষণ চিহ্নিত হয়ে আছে ঃ আশ্রয়-দাতা মহেন্দ্র, নরেন্দ্রের প্রাক্তন বন্ধু, করুণাকে স্বামীর কাছে দিয়ে এল। অমিতব্যয়ী বহু উচ্ছৃঙ্খলতায় বর্তমানে নরেন্দ্র নিঃস্ব। মহেন্দ্রের ব্যবস্থা-করে-দেয়া বাড়ীর আসবাব বিক্রি করেও ফুর্তির টাকার জোগাড় হয় না। সে করুণাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে মহেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা এনে উড়িয়েছে। এবারও নরেন্দ্রের টাকার দরকার।

> নরেন্দ্র ক্রুদ্ধভাবে কহিল, "লিখিতেই হইবে।"
>
> করুণা নরেন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ক্ষমা করো, আমি লিখিতে পারিব না।"
>
> "লিখিবি না? হতভাগিনী, লিখিবি না?"
>
> ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া নরেন্দ্র করুণাকে প্রহার করিতে লাগিল।··· করুণা বার বার মূর্ছা যাইতে লাগিল।··· মহেন্দ্র যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।··· কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত 'নরেন্দ্রকে ডাকিয়া দিবে?' সে কহিত, "কাজ নাই"··· আজ রাত্রে করুণার পীড়া বড়ো বাড়িয়াছে।··· নরেন্দ্র গৃহে নাই। আজ করুণা একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য মহেন্দ্র কে অনুরোধ করিল। নরেন্দ্র যখন গৃহে আসিলেন, তাঁহার চক্ষু লাল, মুখ ফুলিয়াছে, কেশ ও বস্ত্র বিশৃংখল।··· করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল, কিন্তু কিছু কহিল না।[২০]

করুণার ট্রাজিডি ঊনবিংশ শতাব্দীর যে কোন উচ্ছৃংখল যুবকের স্ত্রীর ট্রাজিডি। এর বাস্তব যন্ত্রণা, ক্রন্দন, বেদনা — রবীন্দ্রমানসে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। দেশ-কালের উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন ঘটেছে নরেন্দ্রের বন্ধুবর্গের চরিত্রের মাধ্যমে এবং বিধবা মূক মোহিনীর অব্যক্ত কামনার মধ্য দিয়ে। সমাজসংস্কারক গদাধরবাবু ও কবিতা কুসুম-মঞ্জরী-প্রণেতা স্বরূপচন্দ্রবাবু দুজনই কপট প্রগতিবাদী। নারী-মুক্তির আন্দোলন ও বাস্তব প্রয়োগ দেখাতে তারা ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম প্রয়াসে তাদেরকে ব্যঙ্গে-বিদ্রুপে বিদ্ধ করেছেন, রূপাঙ্কন করতে যেয়ে। স্বরূপবাবু বিধবা মোহিনীর মুক্তির নামে তার প্রতি স্থূলভাবে আকৃষ্ট ছিল; এমনকি করুণাকে আকর্ষণ করার সচেষ্ট প্রয়াসে তাকে ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায়। গদাধরবাবু তো (বৃদ্ধ স্বামী থাকার কষ্ট অনুভব করে) পণ্ডিত মহাশয়ের স্ত্রী কাত্যায়নীকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে গেল। বলাবাহুল্য, কাত্যায়নীর সঙ্গে পণ্ডিত মহাশয়ের অর্থ সম্পদ সবকিছুই নিয়েছিল। একটি দৃশ্যে তাদের সামগ্রিক রূপ প্রকাশিত হয়েছে ঃ একদিন সন্ধ্যায়

নরেন্দ্রের কলকাতার বাগবাজারের ভাড়াটে বাড়িতে সমাজ সংস্কারের সুগভীর প্রগতিশীল আলোচনা চলছিল।

> সে বিধবার ভরণ-পোষণ বাসস্থান ইত্যাদির সমুদয় বন্দোবস্তের ভার নরেন্দ্র নিজ স্কন্ধে লইতে স্বীকৃত হইলেন। ক্রমে ত্রিভঙ্গচন্দ্র বিশ্বম্ভর ও জন্মেন্জয়বাবু আসিলেন, ক্রমে সন্ধ্যাও হইল, প্লেট আসিল বোতল আসিল। গদাধরবাবু স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়া ও স্বরূপবাবু জোৎস্নারাত্রির বিষয়ে নানাবিধ কবিতাময় উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, ত্রিভঙ্গচন্দ্র ও বিশ্বম্ভরবাবু স্খলিত স্বরে গান জুড়িয়া দিলেন।[২১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিধবা বিবাহ আন্দোলন, রামমোহন কর্তৃক, প্রছন্নভাবে সূত্রপাত হলেও সমাজ-মানসে অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে তার কোন সুদৃঢ় অভিঘাত ওঠেনি। কিন্তু বিধবার হৃদয়বৃত্তি তো জীবন-দর্শনের মর্ত্যপ্রীতির অপেক্ষা রাখেনি কোন কালে। সমাজের চাপে, রক্তচক্ষুর ভয়ে হৃদয়েই তার সমাধি হোত। এমনি একটি চরিত্র মোহিনী। পাশের বাড়ীর যুবক মহেন্দ্র। পিতা কর্তৃক স্বার্থ প্রণোদিত বিয়েতে কালোমেয়ে রজনীকে স্ত্রী হিসাবে পেয়ে সে সুখী নয়।

এই অমূলক হৃদয়-বিরোধী বিবাহের প্রতিক্রিয়ায় মহেন্দ্র জীবনাচরণের পরিবর্তন ঘটাল। একটু-আধটু শেরী খাওয়া শুরু করল। এমন মানসিকতায় তার হৃদয় আকর্ষিত হোল — মোহিনীর প্রতি। বৈধব্য জীবনের অবদমিত যন্ত্রণা, কামনা মহেন্দ্রের আকর্ষণে জীবন্ত হয়ে উঠল, মোহিনী যন্ত্রণা-বিদ্ধ হয়ে দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হল ঃ

> আচ্ছা, না হয় ঘাটেই বসিয়া থাকিল, কিন্তু অমন করিয়া তাকাইয়া থাকে কেন। লোকে কী বলিবে। আমার বড়ো লজ্জা করে। মনে করি ঘাটে আর যাইব না, কিন্তু না যাইয়া কী করি। আর কেনই বা না যাইব। সত্য কথা বলিতেছি, মহেন্দ্রকে দেখিলে আমার নানান ভাবনা আইসে, কিন্তু সে সব ভাবনা ভুলিতেও ইচ্ছা করেনা। বিকাল বেলা একবার যদি মহেন্দ্রকে দেখিতে পাই তাহাতে হানি কী। হানি হয় হউক গে, আমি তো না দেখিয়া বাঁচিব না। কিন্তু মহেন্দ্রকে জানিতে দিব না যে তাহাকে ভালোবাসি, তাহা হইলে সে আমার প্রতি যাহা খুশি তাহাই করিবে। আর এ সকল ভালোবাসাবাসির কথা রাষ্ট্র হওয়াও কিছু নয় …।[২২]

রবীন্দ্রউপন্যাসে এই মোহিনীর জীবন জিজ্ঞাসা 'আর কেনই বা না যাইব' প্রশ্ন স্বতন্ত্র

কালিক ও স্থানিক পটভূমিতে এবং উন্নত শিল্পবোধে পরিস্রুত হয়ে বিনোদিনী, দামিনীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ যুগের মোহিনী, প্রবাসী মহেন্দ্রকে স্ত্রী রজনীর কাছে ফিরে আসতে চিঠি লিখল, মহেন্দ্র ফিরে এসে রজনীর কাছে ক্ষমা চেয়ে পাপ ক্ষালন করল।

> রজনী তাহাকে সকল কথা বলিতে লাগিল — শুনিয়া মোহিনীও আহ্লাদে কাঁদিতে লাগিল।[২৩]

এ কান্নার মধ্যে যে তাৎপর্য, যন্ত্রণা, আত্মপীড়ন, আত্মপ্রতারণা আছে — আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না। নারী স্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন হয়েছে,অথচ সমাজে ব্যক্তিত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়নি — এমনি কালের বিধবা মোহিনীদের আত্মপ্রতারক তৃপ্তি ছাড়া কিই বা সম্বল ছিল।

বাংলার রেনেসাঁস পরাধীনতার চক্রে আবর্তিত হয়ে যথার্থ স্বরূপে প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, নারীস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি প্রবণতা কেবলমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশে সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। গণমানসের প্রশ্নে এবং মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্রানুসারে তা ছিল খণ্ডিত। বস্তুত, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দশক পর্যন্ত বাঙালীর অর্থনৈতিক ও মানসিক প্রশ্নে, আমাদের সমাজ ছিল আধা-সামন্ত এবং আধা-ধনবাদী। একদিক দিয়ে একথাটা আজকের সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। করুণার পণ্ডিত মহাশয় হলেন সামন্ত-সমাজের প্রতিনিধি, যা তৎকালীন সমাজের প্রসঙ্গে ছিল জ্বলন্ত সত্য।

> পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন, তাঁহার বয়স সবে চল্লিশ বৎসর। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শপথ করিয়া বলা যায় তাঁহার বয়স আটচল্লিশ বৎসরের ন্যূন নয়।[২৪]

এই বয়সেই তিনি দ্বিতীয় বিবাহে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। কন্যা কাত্যায়নীর বয়স আঠারো বছর।

> অদ্য বিবাহ হইবে। পণ্ডিত মহাশয় কাল সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখিয়াছেন।··· হাসিতে হাসিতে প্রত্যূষেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। চেলীর জোড় পরিয়া চন্দন চর্চিত কলেবরে ভাবে ভোর হইয়া বসিয়া আছেন।[২৫]

তবে পণ্ডিত মহাশয় কেবল রবীন্দ্রনাথের জন্মগত কৌতুকবোধে বিদ্রুপের খোঁচা খেয়েছেন তা নয়, পণ্ডিত মহাশয়ের উদারপন্থী, দয়ার্দ্র হৃদয়ও নবীন ঔপন্যাসিকের

দৃষ্টি পথে ধরা পড়েছে। বৃদ্ধস্যতরুণীভার্য্যা সমস্যা ঊনবিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য বাস্তব ঘটনা ছিল।[২৬] জনৈক বিদ্যাবিশারদের এমনি এক বিয়ের সম্মুখীন হয়েই বিদ্যাসাগরের যুগসঞ্চিত প্রতিবাদী হৃদয় গর্জন করে উঠেছিল। এ সমস্যা প্রমথ চৌধুরীর[২৭] কালেও ছিল, আজও আছে।

দেশকাল করুণায় প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশিত হলেও — এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তার শিল্পপ্রেরণা ছিল মানস-লোকে। গভীর সৌন্দর্যপ্রীতি ও হৃদয়ানুরাগই তাঁকে করুণা রচনায় উৎসাহিত করেছিল, করুণার হৃদয়ের ট্রাজিক পরিণতি, মোহিনীর অব্যক্ত অন্তর-যন্ত্রণাই করুণা রচনার মূল উৎস। বাস্তব জীবনের প্রবর্তনাহীন রবীন্দ্রমানস একান্তভাবেই সমকালীন ভাবসত্যকে এই স্তরের উপন্যাসের মধ্যে রচনা করেছিল। এই মূল সূত্রে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চিন্তা বৌ-ঠাকুরাণীর হাট-রাজর্ষির সঙ্গে, প্রেক্ষিত ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, সংগ্রথিত।

খ.

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮২) এবং রাজর্ষির (১৮৮৫) কাহিনী গঠিত হয়েছে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে। মোগল রাজত্ব কালে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোন কোন রাজা স্বাধীন ছিলেন। এই স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের ক্ষীণ কাহিনীসূত্র অবলম্বনে বৌ-ঠাকুরাণীর হাট এবং রাজর্ষি রচিত হয়েছে। ফলে দেশ-কাল প্রত্যক্ষভাবে এ দুটি উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়নি। ঐতিহাসিক উপন্যাসও একে বলা চলে না—ঐতিহাসিক লক্ষণাক্রান্ত বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে কোন সংজ্ঞাই দেয়া হোকনা কেন—রচয়িতার ব্যক্তি-মানস সেখানে প্রতিফলিত হবেই। সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের দেশকাল বিধৃত মানসিকতার প্রতীকী ছাপ প্রতিফলিত হয়। একথা ওয়াল্‌টার স্কট সম্পর্কে যেমন সত্য, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও তেমনি সত্য। রচয়িতার দেশ-কালের ছাপ পড়ে বলেই পাঠকের আন্তর সাযুজ্য ঘটে ঃ তবে এ প্রতি ফলন—দেশকালের ভাব সত্যের প্রতিফলন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন জাতীয়তাবোধের ভাবধারাই তাঁর রাজসিংহে প্রতিফলিত হয়েছে। এদিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে, বৌ-ঠাকুরাণীর হাট এইং রাজর্ষি উপন্যাসেও রবীন্দ্রমানসের সমকালীন ছাপ পড়েছে। তবে সে মানসিকতা দেশ-কালের অতি অন্তর্মুখীন মানসিকতা।

রবীন্দ্রনাথের পাত্র-পাত্রী অর্থাৎ চরিত্রগুলি সংস্কারে, সমাজে, শিক্ষায় সকলেই বাঙালী। নিজের নর-নারীর সুখ-দুঃখ আশা-আশাঙ্খা লইয়াই তিনি কারবার করিয়াছেন।[২৮]

Theo-centric ধ্যান-ধারণা যখন Anthropo-centric হয়ে উঠে তখনই প্রয়োজন হয় যুক্তিবাদের। ইংলণ্ডীয় রেনেসাঁসের মতো, বাংলার রেনেসাঁসেরও মূলমন্ত্র এই যুক্তিবাদ। যুক্তিবাদ না আসা পর্যন্ত, কোন মুক্তিই সম্ভব নয়। আসলে মানবতাবাদও মুক্তি Godism থেকে, মধ্যযুগের ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে। এই যুক্তিবাদ তথা মানববাদকে স্বীকরণ করতে পেরেছিলেন যে যুগপুরুষ সর্বপ্রথম, তিনি হলেন রামমোহন রায়। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে জাতিকে মুক্ত করতে তিনিই প্রয়াসী হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজ — যে মানবিকতাবোধ, অহিংস-ধর্মনীতি প্রচারের প্রয়াসী হয়েছিলেন তার ভিত্তিভূমি ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠা (৬ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট ১৮২৬) করেন রামমোহন রায়।[২৯] রামমোহন রায়ের এই দেশকাল লব্ধ আত্মচেতনাকে সুদূর প্রসারী করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এসে ধর্মসংস্কার-নীতি একটি অকৃত্রিম হৃদয়ের প্রবর্তনা পেল। দেশানুরাগ, প্রেম-সৌন্দর্যপ্রীতি, অহিংস ধর্মবোধ ইত্যাদি ঊনবিংশ শতকের বাংলার আকাশে বাতাসে আবর্তিত হচ্ছিল। তবে সংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় মানসিকতাও যে বর্তমান ছিল, একথা সত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্যকাল, ঠাকুর পরিবারের এই কুসংস্কারমুক্ত উদার, হৃদয়িক পরিবেশে লালিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দেশ কালের এই ভাবসত্যই বৌ-ঠাকুরাণীর হাট এবং রাজর্ষির প্রতিপাদ্য বিষয়। হৃদয়ের মুক্তি, মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সৌন্দর্যানুরাগের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণই এই স্তরের উপন্যাসের শিল্প প্রেরণা।

> স্বার্থান্ধ এবং বিচারমূঢ় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সর্বজনীন প্রেমের বিরোধ রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাস গল্পের মর্ম কথা।[৩০]

উদয়াদিত্য, সুরমা, বিভা, বসন্তরায়ের স্বাতন্ত্র্যকামী কোমল সৌন্দর্যপরায়ণ হৃদয় কিভাবে নিষ্ঠুর, বস্তুবাদী প্রতাপাদিত্যের বিচারমূঢ় ব্যক্তিত্বের প্রবল সংঘাতে নিষ্পেষিত হল বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে তারই প্রকাশ ঘটেছে। উদায়াদিত্য চায় সুখ-শান্তি, উদার-প্রাণ দাদু বসন্ত রায়ের পবিত্র সংস্পর্শ; পক্ষান্তরে পিতা যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্য প্রত্যাশা করে সে ছাচে-ঢালা উত্তরাধিকারী হবে। সামন্তযুগ এবং আধুনিক জীবনার্থের সংঘর্ষ—প্রেম এবং নিষ্ঠুরতার সংঘর্ষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। উদয়াদিত্যের কথার মধ্যে নিষ্ঠুর বন্ধন থেকে মুক্তিকামী প্রেমিক হৃদয়ের যন্ত্রণা ধ্বনিত হয় :

> আমিতো আর কোন, কোনো সুখ চাই না। আমি চাই, আমি রাজপ্রাসাদে না যদি জন্মাইতাম, যুবরাজ না যদি হইতাম, যশোহর অধিপতির ক্ষুদ্রতম

> তুচ্ছতম প্রজার প্রজাই হইতাম …। সুরমা, রাজার ঘরে জন্মিয়াছি বলিয়া সুখী হইতে পারিলাম না। রাজার ঘরে সকলে বুঝি কেবল উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মায়, সন্তান হইয়া জন্মায় না।[৩১]
>
> মহারাজ, আমি আর কিছুই চাইনা, কেবল আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো গারদে পুরিয়া রাখিবেন না। আমাকে পরিত্যাগ করুন।… যশোহরের সিংহাসনে আমি বসিব না, যশোহরের রাজদণ্ড আমি স্পর্শও করিব না। যদি কখনো করি, তবে এই দাদামহাশয়ের হত্যার পাপ যেন আমারই হয়।[৩২]

বৃদ্ধ বসন্তরায়, প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত, জীবনে কিছুই প্রত্যাশা করেন না। প্রাণের অধিক দুই দাদু—উদয়াদিত্য-বিভার সংস্পর্শে জীবনের তাৎপর্যকে উপলব্ধি করেন। সেতারের মীড়ে, বিভার হাসির রাগিনীতে, উদয়াদিত্যের চির-কিশোর ব্যবহারে তৃপ্তি খোঁজেন। তাঁর বিশ্বাস রাজ্যের চেয়ে হৃদয় অনেক বড় রাজ্য অথচ তাঁর পরিণতিই কি ট্রাজিক। প্রত্যাপাদিত্যের নিষ্ঠুর চক্রান্তে ঘাতকের হাতে তাঁর প্রাণ দিতে হল।

> …প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল আমি তাহাকে দিনরাত কোলে করিয়া থাকিতাম, সে আমাকে একমুহূর্ত ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। সেই প্রতাপ বড়ো হইল, তাহার বিবাহ দিলাম, তাহাকে সিংহাসনে বসাইলাম, তাহার সন্তানদের কোলে লইলাম—সেই প্রতাপ আজ স্বহস্তে এই লেখা মৃত্যুদণ্ড লিখিয়াছে খাঁ সাহেব … এ সংসারে কাহারও দয়ামায়া নাই, এসো সাহেব তোমার আদেশ পালন করো।[৩৩]

বসন্তরায়ের উক্তির মধ্যদিয়ে হৃদয়বাদী মানুষের পরাজয়ের বেদনা উৎসারিত হয়েছে। বস্তুতঃ বস্তুবাদী হৃদয় এবং নিষ্ঠুরতার সংঘর্ষে হৃদয়ের পরাজয় যন্ত্রণা সর্বোপরি ট্রাজিক পরিণতি বৌঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসটিকে দেশ-কাল ধৃত ভাবসত্যের পরিমণ্ডলে প্রসারিত করেছে।

রাজর্ষিতেও ঐতিহাসিক উপাদান মিশ্রিত হয়েছে। রাজর্ষির ঘটনাংশ স্বাধীন ত্রিপুরার রাজ-কাহিনী থেকে নেওয়া হয়েছে। ঔপন্যাসিক নিজে জানিয়েছেন এটি স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুকে দেখতে যান। পথে ট্রেনের মধ্যে স্বপ্ন দেখেন ঃ

> একটা পাথরের মন্দির। ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পূজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে

> মেয়েটির মুখে কী ভয় ! কী বেদনা ! বাপকে সে বারবার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা এত রক্ত কেন ! বাপ কোনো মতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল। জেগে উঠে বল্লুম, গল্প পাওয়া গেল।[৩৪]

এই স্বপ্ন দেখার মধ্যেই রাজর্ষির গল্প বিন্যাসের মূলসূত্র নিহিত একথা সর্ব সত্য নয়। বরং ঐ স্বপ্নের কার্য-কারণ সূত্রের মধ্যেই দেশ-কাল বিধৃত হয়ে আছে। ফ্রয়েড তাঁর The Interpretation of dream গ্রন্থের মধ্যে বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, যার মূল কথা হোল, কোন ব্যক্তির সমকালীন দেশ-কালের বস্তু-লোক তার মানসলোকে যখন অভিঘাত তোলে, তখনি মানুষ স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন কখনো প্রতীকী রূপ পায়, কখনো বাস্তব রূপ ধরে প্রকাশ পায়। বস্তলোকের অভিঘাত থেকে উত্থিত — চেতন মনের কোন কোন ক্রিয়া, কোন কারণে মনের আলোকিত স্তর থেকে বিচ্যুত হয়ে, মনের গভীরতর গোপন অবচেতন স্তরে নিরুদ্ধ হয়ে থাকে। অবচেতন মনের এই নিরুদ্ধ কামনাই স্বপ্নরূপে প্রতিভাসিত হয়। সুতরাং বালিকার এত রক্ত কেন, রবীন্দ্রমানসেরই প্রশ্ন। তাঁর যুগধর্ম অনুযায়ী প্রেমিক হৃদয়, সংস্কারবাদী মনুষ্যত্ববোধ — বাস্তব জগতের ধর্মের নামে জীব-হত্যার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকামী ছিল। এই সত্যই রাজর্ষিতে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া কর্তব্যবোধের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব; প্রেমের আবির্ভাবে মানুষের হৃদয়ের অগ্নিশুদ্ধি ঘটে, ব্যক্তিত্বের ও হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে উৎসারিত এ সব সত্যও — যা দেশ-কালের ভাবসত্য — রাজর্ষিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তবে মূল সৃষ্টি-প্রেরণা ছিল কুসংস্কারবোধ ও মুক্ত-বুদ্ধি, মানবিকতার দ্বন্দ্ব এবং শুভবুদ্ধির বিজয় প্রতিপন্ন করা। মুক্তবুদ্ধি, মানবিকতার পরিস্ফুটন ঘটেছে রাজা গোবিন্দ মানিক্যের চরিত্রে। তার উক্তি :

> ··· না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।[৩৫]

পক্ষান্তরে রঘুপতি প্রাচীন-সংস্কারে-বিশ্বাসী রাজ পুরোহিত, তিনি বলি বন্ধের বিরুদ্ধে। তিনি সংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় মানসিকতার, নিষ্ঠুরতার প্রতিচ্ছবি। জয়সিংহের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি যুগানুগ দ্বন্দ্ব, সে রঘুপতির সংস্কারে লালিত আবার গোবিন্দমানিক্যের মুক্তবুদ্ধি উদারতার প্রতি আকৃষ্ট। গোবিন্দমানিক্য ও

রঘুপতির সংঘর্ষের মধ্যে, জয়সিংহের আত্মদ্বন্দ্ব ও আত্মবিসর্জন ট্রাজিক পরিণতি লাভ করেছে। জয়সিংহ যুগধর্মের (আত্মবিরোধের) স্বরূপকে অঙ্কিত করেছে। ত্রিপুরায় প্রাচীন সংস্কার বিশ্বাসী সাধারণ লোকদের উপস্থিতি, বাংলার অশিক্ষিত ধর্মভীতু সরল-হৃদয় গ্রাম্য মানুষদেরকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।[৪৬]

গ.

চোখের বালি (১৯০২)[৩৭] এবং নৌকাডুবি (১৯০৭)[৩৮] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনা। রাজর্ষি রচনার পনের ষোল বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ পুনরায় উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। এর মধ্যে গল্প রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। এখন তাঁর বয়স উত্তীর্ণ-চল্লিশ। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজ রাষ্ট্র সম্পর্কে গভীর ভাবে তিনি চিন্তা করছেন— মা ভৈঃ, অত্যুক্তি, ইত্যাদি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। একালে রবীন্দ্রনাথ কেবল সামাজিক, রাষ্ট্রিক অবস্থার দ্বারা উদ্বোধিত হচ্ছেন না, ব্যক্তি ধ্যানধারণাকেও সমাজের, রাষ্ট্রের কাছে স্পষ্ট করে তুলছেন।

এ পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে রবীন্দ্রনাথ দেশ-কালের পটভূমিতে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঘটনাংশ এবং চরিত্র ও চরিত্রের ধ্যানধারণা সমূহ মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে গৃহীত। চোখের বালি বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ, একথা অবশ্য স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের চোখেরবালি রচনার আগে বাংলা সাহিত্যে সামাজিক উপন্যাস লেখা সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ বন্দোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী আরো অনেকেই উপন্যাসের এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখের বালিই আধুনিক অর্থে প্রথম সার্থক বাংলা সামাজিক উপন্যাস। এর সারসত্য নিহিত রয়েছে দেশ-কাল-পটভূমি বা সমাজ রাষ্ট্রকে উপলব্ধি করার দৃষ্টিকোণের তারতম্যের মধ্যে।

পূর্বে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেশ-কাল বিধৃত সমাজ ও মানুষের দুটি রূপ আছে — প্রথমত সমাজের বাস্তব সত্য, দ্বিতীয়ত দেশ-কালধৃত মানুষের ভাব বা মানস সত্য ; অবশ্য একটির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে অপরটির অস্তিত্ব থাকে না। সমাজ সংঘাতের ফলে ভাব-সংঘাত অনিবার্য, আর ভাব সংঘাতই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য, এই ভাব সংঘাতই প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যের নূতন গতি-বেগ সঞ্চার করে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব আমরা লক্ষ্য করেছি, ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে তারা সমাজের নিয়ন্ত্রণী শক্তিকে অধিকার করেছে।

এতদিনে তারা রেনেসাঁসের মূল্যবোধ গুলিকে সমাজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ইংরেজ শাসনের নীতি অনুসারে মধ্যবিত্ত এবং ধনীক শ্রেণীর পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়নি, পক্ষান্তরে মধ্যবিত্ত সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে আত্মবিরোধ—তারা তা ঐতিহাসিক ভাবেই বহন করে চলেছে। পরাধীন বা ঔপনিবেশিক দেশের জাগরণের মূল-বৈশিষ্ট্য এই যে — সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতই বিশ্ব-ধনবাধী সমাজের অনুরূপ পর্যায়ে না উঠতে পারলেও, চিন্তা-ধ্যান-ধারণা এবং অন্যান্য মূলবোধের প্রশ্নে তারা আত্মপ্রসার ঘটিয়ে থাকে। পরাধীনতা তাদের মানস প্রবাহকে বাধা দিতে পারে না।[৩৯] ফলত সারা উনিশ শতকে সমাজব্যবস্থা এবং সমাজ বিন্যাসের সঙ্গে, জীবনার্থ মূল্যবোধের সঙ্গে ভাবলোকের দ্বন্দ্ব অনিবার্য ছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই শতমুখী ধ্যান-ধারণার পারস্পরিক সংঘর্ষের ও আত্ম-দ্বন্দ্বের পটভূমিতে এই স্তরের উপন্যাসগুলির সমাজ ও ভাবসত্য বিধৃত হয়ে আছে। চোখেরবালির বিনোদিনীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী হৃদয় ও মনোলোকের যুগানুগ প্রতিষ্ঠা কামনার স্বরূপ অবলোকন করে সামন্ত সংস্কার-মুখী মধ্যবিত্ত সমাজের অনেকেই বিচ-লিত ও উত্তেজিত হয়েছিল :

> যে বঙ্গদর্শনের বক্ষে একদিন বঙ্কিমবাবুর ও বাঙ্গালা ভাষার সুবিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠতম নবেল 'বিষবৃক্ষ' ও 'চন্দ্রশেখর' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই আজ রবিবাবুর 'চোখেরবালি' বাহির হইতেছে। ··· আপাততঃ মোটের উপর এই বক্তব্য যে, রবিবাবু নির্ভীক স্বরে যে ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ ও সর্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য তাঁহার ও তদীয় বঙ্গদর্শনের পক্ষে 'অমার্জনীয়' প্রচার করিয়া তাহাদের সংস্পর্শবিরহিত হইতে প্রথমেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, সেই ভীরুতা, সেই রুচিভ্রংশ, সেই সত্যের অপলাপ এবং সেই সর্বপ্রকার সাহিত্য-নীতির শৈথিল্য ষড়যন্ত্রে একযোট হইয়া তাঁহার এই কুৎসিত আখ্যানের আরম্ভ হইতে উপস্থিত অধ্যায় পর্য্যন্ত পূর্ণগ্রাস করিয়াছে। ...যাহাই হউক আমরা বলিতেছি···যে, রবিবাবু এতবড় লম্বা ও এমনতর কুৎসিত উপন্যাসে হাত দিয়ে একেবারেই ভাল করেন নাই।[৪০]

এই স্তরের উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন জটিলতা, আত্মবিক্ষোভ, মানস-দ্বন্দ্ব, ভাব-সংঘাতকে কেবল ঘটনাংশে রূপায়িত করলেন না, বরং মনের তলাশ্রয়ী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবর্ত ও তার পরিণতির গুরুত্বকেও বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে প্রকাশ করলেন। সুরেশ সমাজপতির উপরোক্ত

মন্তব্যের তীব্রতার মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথের দেশ-কালের প্রতি দৃষ্টি-সত্যের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। 'কাহিনীটি বাস্তব হোক বা না হোক' উক্তির মধ্যদিয়ে সুকুমার সেন[৪১] চোখের বালির বাস্তবতার প্রসঙ্গে সংশয় প্রকাশ করেছেন। দেশ-কালে সংঘটিত বাস্তব ঘটনা যে বড় সত্য একথা আজ আমরা স্বীকার করি না, বরং সমাজের মানস-লোকের সত্যই বড় বাস্তব। অধুনা উপন্যাসের ক্রমবিকাশ বাস্তব-ঘটনা-লোক থেকে মনের বিচিত্র সত্যের বাস্তবতা উদঘাটনের দিকে। একথা ভুললে, চোখেরবালির গুরুত্ব যা অধিকাংশ সমালোচক কর্তৃক স্বীকৃত—তার সত্য-নির্দেশে ত্রুটি থাকে। তাছাড়া কল্পনার বাস্তবতাই সাহিত্যের বাস্তবতা।

চোখেরবালির প্রধান ভূমিকা বিনোদিনীর। এই চরিত্রের অন্তর-সত্যের উজ্জ্বলতায় সমগ্র উপন্যাসখানি উদ্ভাসিত। বিনোদিনী বিধবা, শিক্ষিতা তরুণী। তার বৈধব্যের কারণ বহুলাংশে তার দারিদ্র্য, আর আছে মহেন্দ্রের একদিনের মূঢ়তার সংযোগ। বাংলা উপন্যাসে বিধবার একটা ভূমিকা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দনন্দিনী প্রেমকাতর, সলজ্জ কুণ্ঠিত; করুণার মোহিনী হৃদয় কামনাকে অবদমন করেছে যন্ত্রণায়, আহ্লাদের কান্নায়; তবে প্রশ্ন তুলেছে 'কেন না যাইব?'। দেশ কালের ভিন্ন প্রেক্ষিতে শিক্ষিতা বিনোদিনী ভাগ্যকে যেন মানতে চায় না। বিনোদিনী সমাজের মুখ চেয়ে চলতে জানে না, সে কেবল তার মর্যাদা চায় না, চায় তার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি মূল্যের স্বীকারোক্তি। সমাজের উপেক্ষায় তার হৃদয় কেবল অতৃপ্ত ভালবাসা এবং জীবনরসের জন্য উদগ্র হয়েই ওঠে নি, হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী, ঈর্ষা-পরায়ণ; অতৃপ্ত কামনার অসন্তোষ সে নিয়ে কেবল আশা-মহেন্দ্রের সংসার জ্বালেনি, নিজে কেও বিনষ্ট করেছে। বিনোদিনী মানসিকতার ক্রমবিকাশের সম্ভাব্যতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাস্তব জ্ঞান, বোধ বিধৃত হয়ে আছে।

> ক্ষুধিত হৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।
>
> নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে মা যখন ঘুমাইতেছেন···নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে চিলের তীব্র কণ্ঠ অতি ক্ষীণ স্বরে কদাচিৎ শুনা যাইতেছে, তখন নির্জন শয়ন গৃহে নিচের বিছানার বালিশের উপর আশা তাহার খোলা চুল ছড়াইয়া শুইত এবং বিনোদিনী বুকের বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া গুন গুন গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত, তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত, নিশ্বাস বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।[৪২]

এমনি ভাবে আশার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, অসচেতন কৌতূহলে বিনোদিনীর সুপ্ত কামনা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠ্‌ল। শিক্ষিতা বিনোদিনীর তীব্র আত্মসচেতনা এবং গৌরববোধ অহংকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেতে থাকে। সে ভাবতে বাধ্য হয় 'আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।' মহেন্দ্রের উপেক্ষা বিনোদিনীর উচ্চমন্যতা-বোধকে তীব্র ভাবে আঘাত কোরে বিনোদিনীর ঈর্ষাবোধকে জাগিয়ে তোলে ঃ

> এতকাল বাড়িতে আছি, মহেন্দ্র যে একবার আমাকে দেখিবার চেষ্টাও করে না ··· এত ঔদাসীন্য কিসের। আমি কি জড় পদার্থ। আমি কি মানুষ না। আমি কি স্ত্রীলোক নই। একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আদরের চুনির সঙ্গে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত।[৪৩]

এই ভাবে সমাজ-সংসারের মধ্যে বিনোদিনীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, তার অতি-সুক্ষ্ম বহু বঙ্কিম অনুভূতি এবং মানসিকতাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিজ্ঞ সমাজ বিজ্ঞানী এবং মনস্তাত্ত্বিকের মত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ; দেশকাল পরিবেশে তার এই মানসিক বিভ্রান্তিকর অনুভূতিগুলির আত্মপ্রকাশ কত স্বাভাবিক, কত সহজ, কত যথাযথ রবীন্দ্রনাথ 'চোখেরবালিতে' মহেন্দ্র-আশা, রাজলক্ষ্মী এবং বিহারীর ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তা বিকশিত করেছেন।

চোখেরবালির ছায়া যেমন নৌকা ডুবিতে পড়েছে গোরার পূর্বাভাসও তেমনি এতে পড়েছে।[৪৪] নৌকাডুবির ঘটনাংশ গার্হস্থ্য পরিমণ্ডল থেকে বৃহৎ সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত হয়েছে। ব্রাহ্ম-সমাজের অস্তিত্ব, আদর্শ ও তার বিশ্লেষণ, সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম-সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট আলোড়ন নৌকাডুবিতে প্রথম উপস্থিত দেখি। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র (বিষবৃক্ষে), তারকগাংগুলি (স্বর্ণলতায়) ও যোগেন্দ্র বসু (মডেল ভগিনীতে) ব্রাহ্ম-সমাজের অভাবাত্মক দিকের অতিরঞ্জিত বর্ণনা লিপি-বদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে দেশ-কালের প্রেক্ষিতে তার সামাজিক স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এই উপন্যাসের সব চরিত্রগুলিই প্রায় চোখের-বালির মতই মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে গৃহীত। দেশের বিস্তৃত এলাকায় নৌকাডুবির ঘটনা বিস্তারিত হয়েছে ; গ্রাম থেকে শহর কলকাতার কলুটোলা, দরজিপাড়া এবং ময়মনসিংহ থেকে কাশি-এলাহাবাদ পর্যন্ত। নৌকাডুবিতেই দেশ-কালের বিস্তৃত প্রেক্ষিত — তার সামাজিক বাস্তব সত্য এবং ভাবসত্য (অবশ্য মধ্যবিত্ত সমাজের) সম্মিলিত ভাবে স্থান পেয়েছে। এদিক দিয়ে এ উপন্যাস গোরার পূর্ব-ছায়া। মধ্যবিত্ত-

সমাজ-মানসের বড় বৈশিষ্ট্য প্রাচীন এবং আধুনিক জীবনাচরণের দ্বন্দ্ব, এবং বিচিত্রমুখী জীবন-দৃষ্টির, জীবনবোধের সম্মিলন।[৪৫] অন্নদা বাবু, হেমনলিনী, যোগেন্দ্র, অক্ষয়-বাবু, কমলা, রমেশ এবং খুড়ো মহাশয় প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত সমাজের বৈচিত্র্যেরই প্রতিনিধি। গ্রামে প্রতিপালিত আজন্ম হিন্দু সংস্কারে লালিত কমলা — হিন্দুনীতি-আদর্শে চূড়ান্তভাবে বিশ্বাসী। যুক্তিবাদ নয়, ভক্তিবাদ এবং সেবাধর্মই তার স্ত্রীধর্ম। তাই দীর্ঘকাল ভুলক্রমে রমেশকে স্বামী বলে জেনেও, যখন জানতে পারলে নলিনাক্ষ তার স্বামী সে মুহূর্তেই নলিনাক্ষকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করলে; রমেশের জন্য একটু দ্বিধাও মনে উপস্থিত হোল না। বরং নলিনাক্ষের স্মৃতিতে তাকে বিভোর হতে দেখা যায় —

> রমেশ হেমনলিনীকে যে চিঠি লিখিয়াছিল সেখানি কমলার আঁচলের প্রান্তে বাঁধা ছিল, সেই চিঠি খুলিয়া বালুতটে বসিয়া তাহার একটি অংশ পড়িতে লাগিল। … 'নলিনাক্ষ' এই নামটি তাহার মনের মধ্যে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল; এই নামটি তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন ভরিয়া তুলিল; এই নামটি যেন এক বস্তুহীন দেহ লইয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল … মনে হইল, তাহার অসহ্য দুঃখদাহ যেন জুড়াইয়া গেল।[৪৬]

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্রমুখী চিন্তাধারা-সম্পন্ন মানুষের মধ্যে কমলার মত হিন্দু-সংস্কারে সমর্পিত প্রাণ রমণীর অস্তিত্ব দুর্লক্ষ্য নয়। পক্ষান্তরে হেমনলিনীর মত স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অন্নদাবাবুর মত উদার-প্রাণ ব্রাহ্ম, যোগেন্দ্রের মত আন্তরিক বাস্তববাদী, অক্ষয়বাবুর মত সুবিধাবাদী চরিত্রগুলি গত শতাব্দীর দেশ-কাল-সমাজের ভাব-মানসকেই প্রতিফলিত করেছে। এসব বিচিত্র সামাজিক মানুষগুলিই সুবিশাল দেশ-কালের প্রেক্ষিতে 'গোরায়' আরো সুস্পষ্ট, যথাযথ রূপবান হয়ে উঠেছে।

৫

গোরা (১৯০৯)[৪৭], চতুরঙ্গ (১৯১৬)[৪৮], ঘরে-বাইরে (১৯১৬)[৪৯], এবং যোগাযোগ (১৯২৯)[৫০] তৃতীয় পর্যায়ের রচনা। এই স্তরে তাঁর উপন্যাসে আমরা দেশ-কাল-পটভূমিকে, মানস-দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা, সংঘাতের প্রেক্ষিত হিসাবে উপস্থাপিত হতে দেখি। উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের জাতীয় জীবনের আলোড়ন, সংঘাত, ঘূর্ণাবর্ত ইত্যাদিকে সর্বগ্রাহী রবীন্দ্রমানস উপন্যাসে শিল্পরূপ

দিয়েছেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে গোরাকে এপিকধর্মী উপন্যাস হিসাবে আখ্যা দেয়াতে সার্থকতা আছে।

এ স্তরের উপ ন্যাসের দেশ-কাল-বিধৃত ভাবলোকের উপলব্ধি করতে হলে তদ্-কালীন সমাজ এবং রাষ্ট্রীক ধর্মনৈতিক আন্দোলন-সংঘাতের স্বরূপ আমাদেরকে প্রতিটি রচনার জন্য পৃথক ভাবে আলোচনা করতে হয়। অন্যথায় রবীন্দ্র উপন্যাসে ধৃত দেশ-কালের স্বরূপ নির্দেশ অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। কারণ কোন কালেই রবীন্দ্র সৃষ্টি একই বৃত্তে আবর্তিত হয় না, রবীন্দ্রমানসের এই পরিবর্তন বা বিবর্তনশীলতাই যেমন তাকে লোকসমাজে বিভ্রান্তিকর করেছে, তেমনি সৃষ্টিলোকে তাঁকে মহৎ করেছে। বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষিতে ভাল-মন্দ সকল মানুষের জীবন প্রয়াসকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (তাঁর সমগ্রতাবোধ থেকে উৎসারিত শিল্পমানস দিয়ে) আঁকতে চেষ্টা করেছেন। নিম্নোধৃত উদ্ধৃতি থেকেই ভিন্ন প্রেক্ষিত গ্রহণের কার্যকারিতাকে উপলব্ধি করা যায়।

> And then there are Tagore's young heroes, a whole galaxy of contemporary Indian portraits, from the lovers who have learnt through modern education not to regard woman as a mere landscape, the friends Gora and Benoy, and Amulya, the young student, devoted unto death and the tough Europeanised share pushers and go-gethers, Haran, Sandip, Amit Roy and Co. Representatives of our age, they do not offer much hope ; bitter, disillusioned, impetuous mostly concerned to make romantic gestures, they are only relieved by the fact that Rabindra Nath shows very skilfully how much more they are sinned against the sinning. Victims of Moloch they lapse for lack of opportunities, leaving their ideals behind them. But in the lovable and human qualities which cling even to the most vicious of them, they remain in our memory as the poignant symbols of fighters who fell in the all embracing, manifold struggle of our generation to find a new way of life.[৫১]

গোরা উপন্যাসের পটভূমি ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত-সমাজ কিভাবে সৃষ্ট হল। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) কিছু দিন

পূর্ব পর্যন্তও উচ্চতর সমাজে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ সত্ত্বেও একটা আত্মপ্রসাদের ভাব ছিল। মূল কারণ ছিল তখনকার সীমিত মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবোধ। কিন্তু হিন্দু-কলেজ, সংস্কৃতকলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার পর — অল্পকিছুদিনের মধ্যেই মধ্যবিত্ত সমাজ দ্রুত বেড়ে ওঠে। এই ক্রম বর্ধমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের সার্বিক অধিকার দেবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা ধনবাদী ইংরেজ-নীতির, শোষণ-পদ্ধতির বিরুদ্ধ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক বিদ্রোহ — নীল-বিদ্রোহ (১৮৬১তে ব্যাপকরূপ নিল), পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২ —৭৩), সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি তাদের সুনিশ্চিত করল যে ইংরেজ শাসন মধ্যবিত্ত-সমাজের মুক্তি দিতে পারে না।[৫২] রামমোহন রায় প্রবর্তিত স্বাদেশিকতাবোধ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যদিয়ে একটি ব্যাপক রূপ নিল।

যে কারণেই হোক—আত্মঅহংবোধের জন্যেই হোক, অর্থনৈতিক রাষ্ট্রিক প্রতিকূলতা বা ধর্মীয় কুসংস্কারের জন্যই হোক — ইংরেজ শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম হওয়ায় বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ নব-জাগরণকে আলিঙ্গন করতে পারেনি। মধ্যবিত্ত সমাজে হিন্দু-প্রাধান্য দেখা দিল।

> The upper strata of the Muslim community in the Pre-British period, were, on the whole, divorced from mediaval trade or money lending and were mainly engaged in military and administrative careers. Further, they predominantly resided in Northern India which came under British rule much later. The vast Muslim population of Bengal mainly belonged to the poorer classes. Hence a modern intelligentia, a modern educated middle class and a bourgeoisie, on a substantial scale sprang from within the Muslim community later than from within the Hindu community.[৫৩]

ফলে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ স্বাদেশিকতার স্বরূপ্য এবং মূল-প্রেরণা হিসাবে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। মধ্যবিত্ত সমাজ ঐতিহাসিক গতিধারা সম্বন্ধে অসচেতন ছিল। সদ্য সামন্ত-সমাজ থেকে উদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজ শাসকের উপনিবেশবাদী রূপকে (যে নীতি মধ্যবিত্ত সমাজকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপীড়িত করছিল) প্রতিবাদ করতে যেয়ে ধনবাদী গনতান্ত্রিক রেনেসাঁস-উত্তর পরিবর্তিত জীবনা-চরণ ও সমাজ-বিন্যাসের বিরুদ্ধেই দাঁড়াল। ফলে জাতীয়তা বলতে হিন্দু মধ্যবিত্ত

সমাজ 'প্রাচীন-হিন্দু-সভ্যতায়' ফিরে যাওয়াকে বুঝতো। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এবং মূল্যবোধ ও ধর্ম-সংস্কারগুলিকে তারা পাশ্চাত্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে একটি দার্শনিক ভিত্তি দিল। ফলে অবিলম্বে স্বাদেশিকতা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী (Hindu Revivalism) স্রোতে — রূপান্তরিত হল হিন্দু-জাতীয়তাবাদে[৫৪]। পাশ্চাত্য ভাব-ধারার নতুনত্ব, তার বিচার বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতাই এই ধারার বৈশিষ্ট্য। যা কিছু নতুন, মহান উদার, তা সব এদেশেই ছিল। ধর্ম আশ্রম মঠ সবই থাকল, কিন্তু তাও যে কত মহান, কত মানবিক, কত উদার, কত গতিশীল, এমন কি কতদূর সমাজতান্ত্রিক পর্যন্ত হতে পারে, বিবেকানন্দ তা শুধু এদেশের লোককেই বললেন না, বিদেশেও প্রচার করলেন।[৫৫] স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই মতবাদে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা যুগিয়ে ছিলেন।[৫৬] তবে অতি শীঘ্রই তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। এই হিন্দু জাতীয়তা-বাদ-এর দ্বারাই উনবিংশ শতকের শেষে পাদের বাংলার চিত্তলোক শাসিত হয়েছিল। বিদেশে ইংরেজের নৃসংশতা প্রকাশ পেল বোয়ার যুদ্ধে, এতে জাতীয়তাবাদীগণ আত্মশ্লাঘাপরায়ণ হয়ে উঠল।[৫৭]

উনবিংশ শতকের জাগরণে, স্বাদেশিকতায়, ধর্মবোধে — ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব-শালী একটা ক্ষমতা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেনের যুগ্ম প্রয়াসে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচার এবং প্রভাব বিস্তৃত হয়। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক রূপটি ছিল পুরোপুরি সংস্কারমূলক।[৫৮] সনাতন ধর্মের নামে জাতীয়তাবাদী হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজের বিকাশ পথ বঙ্কিম হয়ে ওঠে, প্রথমাবধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একটু মন্থর গতি। ১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র সেন, পৃথক ভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ নাম দিয়ে ভিন্ন, বিপ্লবী মত প্রচার করতে থাকেন। এমনি মুহূর্তে দেশে হিন্দুত্বের সনাতনী পদ্ধতির পুনর্জাগরণ ঘটছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে প্রসারিত করছে নিজেদের। ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে বললেন : The term Hindu does not include the Brahmo.[৫৯]

মন্থরগতি ব্রাহ্মরা আক্রমণ করলেন কেশবসেনকে সুতীব্র ভাবে। তবে এদের সেই আক্রমণ যতনা কেশব-পন্থীদের সমালোচনামূলক তার চেয়ে অধিক লক্ষ্য ছিল, প্রাচীন-হিন্দু-সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। রাজনারায়ণ বসু ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু ধর্মরে শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রস্তাব নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করলেন : মূল বিষয়, হিন্দু ধর্ম শ্রেষ্ঠ কেননা উচ্চাধিকারীদের জন্য আছে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা আর নিম্নাধিকারীদের জন্য প্রতীক উপাসনা — ব্রাহ্মধর্ম উন্নত হিন্দুধর্ম। হিন্দু

পুনরুত্থানবাদী মানসিকতার জন্য এরা যেমন রূপান্তরিত হয়েছিলেন, পক্ষান্তরে হিন্দুত্বের পুনরুত্থানে এটি এক বড় সহায় হয়েছিল। সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ যখন জাতীয়তার নামে সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের নেশায়, ইংরেজ সরকার, ইংরেজী-রীতি-নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, তখন স্বভাবতই কেশব চন্দ্রের ব্রাহ্ম-সমাজ ও পরবর্তি কালের নব্য-ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে বিন্দু জাতীয়তা ও সনাতন ধর্মকে আশ্রয় করে স্বাদেশিকতার পতাকাবাহী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। সনাতন ধর্মবাদী এবং এই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। যার যার সীমাকে তারা সুদৃঢ় ভাবে রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

যাহোক, উক্ত জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতা (যেখানে বিশেষ এক ব্রাহ্মশ্রেণীর ও আপামর মুসলমান সমাজের সম্পর্ক ছিল না) এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদির মধ্যে থেকে একটি অতি ক্ষুদ্র তাপস দল দেখা দিলেন। এঁদের কণ্ঠেও হিন্দুত্বের মহিমার কথা যথেষ্ট আবেগে উচ্চারিত হল, কিন্তু সেই তত্ত্ব দিয়ে এঁরা দেশবাসীদের মাতাতে চাইলেন না বরং তাদের চিত্ত আলোকিত করতে চাইলেন ইয়োরোপের চাইতে আরো মহৎ আরো কার্যকর লক্ষ্য তাদের সামনে ধরে—তাদের কর্মশক্তিকে ব্যাপকভাবে সক্রিয় করতেও তাঁরা চেষ্টা করলেন।[৬০] এই অতি ক্ষুদ্র তাপস দলের পরিচ্ছন্ন মনের কথাটি রূপ পেয়েছিল রবীন্দ্রমানসে।

> ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীর ভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে, দাস ভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিক ভাবে, সাধক ভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন নানা দিক থেকে আমাদের ব্যর্থ হতে হবে।[৬১]

গোরা বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত একমাত্র উপন্যাস, যে উপন্যাসে সমগ্র শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বিশেষ যুগের সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক চিন্তাধারা ও আদর্শ, সমস্ত বিক্ষোভ ও আন্দোলন, ধর্ম ও জাতীয় জীবনের নূতন আদর্শ সন্ধানের সমস্ত ভাবাবেগ ও চিন্তা বিপর্যয়, যুক্তি তর্কের উত্তাপ, অনুভূতির উদ্দীপনা, বুদ্ধি ও বীর্যের দীপ্তি, এক কথায় একটি সমগ্র দেশ ও জাতির পুরোগামী একশ্রেণীর সমগ্র জীবনধারা রূপ লাভ করেছে। তীব্রভাবে সনাতন ধর্মের, হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিস্ফুট হয়েছে গোরা চরিত্রের মধ্যে।[৬২] গোরা হিন্দু ধর্মের আচার সংস্কারের প্রশ্নে গোঁড়া। মা আনন্দময়ী, গোরার বন্ধু বিনয়কে খেতে ডাক্‌লে, গোরা বলে :

না, মা, সে হচ্ছে না। তোমার ঘরে আমি বিনয়কে খেতে দেব না।[৬৩]

আনন্দময়ীর অপরাধ খৃষ্টান দাসী লছমিয়াকে আশ্রয় দিয়েছেন তিনি; আচার-সংস্কার সম্পর্কে নিজেও শিথিল। গোরার জীবনাদর্শ :

> যে দেশে জন্মিয়াছি সে দেশের আচার, বিশ্বাস, শাস্ত্র ও সমাজের জন্য পরের ও নিজের কাছে কিছু মাত্র সংকুচিত হইয়া থাকিব না। দেশের যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব।[৬৪]

পরেশবাবু এবং আনন্দময়ী এক ধর্মাবলম্বী নন; কিন্তু কোন ধর্মের নিষ্ঠুর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধও নন। আনন্দময়ী হিন্দু কিন্তু তাদের স্ব-সমাজের চোখে তাঁর উদারতার জন্য তিনি ধিক্কৃত। পরেশবাবু ব্রাহ্ম অথচ একই কারণে — মুক্ত স্বাধীন হৃদয়ের জন্য — ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক নিন্দিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একদল তাপসের জন্ম হচ্ছিল — পরেশবাবু, আনন্দময়ী তাঁদেরই প্রতিচ্ছবি। তাঁরা জাতীয় চিন্তাধারার গণতান্ত্রিক ও মানবতান্ত্রিক বোধের ক্ষীণ প্রকাশ, তাঁদের চিন্তাধারা প্রচণ্ড হিন্দু পুণর্জাগরণের স্রোতে অবদমিত, নিষ্পেষিত হচ্ছিল।

পক্ষান্তরে অবিনাশ সংকীর্ণ অপরিবর্তনশীল-সনাতনী; হারাণবাবু সংকীর্ণ ব্রাহ্ম। সুচারিতা-ললিতা-বিনয় চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণ ধর্মবোধের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ধর্মবোধের দ্বান্দ্বিক রূপ লক্ষ্য করা যায়। বিনয়, ললিতা, সুচরিতার হৃদয় নিষ্পেষিত হচ্ছে গণ্ডীবদ্ধ ধর্ম এবং জীবনাচরণের শৃংখলে; মুক্তি কামনা করছে—অথচ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে কত বাঁধা, কত দ্বন্দ্ব। তুলনামূলক ভাবে বিনয় চরিত্রটি জাতীয় চিন্তাধারার এই দ্বন্দ্বপূর্ণ দিকটি উদ্ঘাটিত করেছে। গোরা উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য — সমস্যার বিশ্লেষণ এবং বিতর্ক। সুদীর্ঘ উপন্যাসের মধ্যে ইংরেজ সরকার থেকে ব্রাহ্মসমাজ, হৃদয়-ধর্ম থেকে বণিক চরিত্র পর্যন্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামগ্রিক রূপকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গোরার পটভূমি এবং দেশকাল বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বলেছি, একটি তাপস দল বিক্ষুব্ধ জাতিকে মুক্তির সন্ধান দিয়েছিল। গোরা শেষ পর্যন্ত সেই অভিজ্ঞান লাভ করল :

> আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন …। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই

> মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই, যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না, যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন — যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।[৬৫]

বলাকা-পর্বের সমকালীন উপন্যাস চতুরঙ্গ (১৯১৬)।[৬৬] মধ্যবিত্ত সমাজভুক্ত মানুষের আত্মমুক্তির পথ সন্ধানের বৈচিত্র্য এবং পরিণতি এর প্রেক্ষিত। গোরার দেশকাল-পটভূমি থেকে চতুরঙ্গের উপস্থিতি মানুষের মনোলোকে। এখানে জাতীয়তা-বাদ নেই, ইংরেজ সরকার মেই, হিন্দু ধর্মের আচার নেই — রয়েছে ঊনবিংশ শতকের কয়েকটি ব্যক্তির জীবনাচরণের পদ্ধতিগত বৈচিত্র্য এবং দ্বন্দ্ব।

শচীশ প্রথম জীবনের নাস্তিকতা থেকে — ঘোরতর ভাবের সাধকে পরিণত হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ জীবনে দামিনীর জীবন রসের আহ্বান তার হৃদয়ে আলোড়ন তুলল। নাস্তিকতা এবং বস্তুবাদী মানসিকতা থেকে অতি আধ্যাত্মিক, বৈরাগীতে পরিণত হবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত — ঊনবিংশ শতাব্দীতে দুর্লভ নয়। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনের ইতিহাসে, এ সত্য প্রকাশিত হয়েছে। গত শতাব্দীতে বৃহত্তর সামাজিক প্রবণতা ছিল, ধর্মের কিছুই না মানা এবং ধর্মের সব কিছুকেই নির্বিচারে স্বীকার করা। একজন য়ুরোপীয় Humanism বা মানবতা ও কর্মকেই ধর্ম বলে জানে; অপরজন নব্য-হিন্দু সমাজের কৃত্রিম জীবনের মধ্যে ভাব-প্রবণ তথাকথিত বৈষ্ণবতাকেই সার বলে মানে।[৬৭]

জগোমোহন নাস্তিক, তিনি লেশমাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহ মাত্র পাছে কারও মনে আসে, 'এই ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না তার মধ্যেও তাঁর ওই ভাবটা ছিল। লৌকিক বা অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাত জোড় করিতে নারাজ।' জগোমোহন বলেন :

> আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানিনা বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।[৬৮]

জগোমোহনের কোন সংস্কার ছিল না, শচীশকে পদধূলি নিতে দিতেন না। মুসলমান চামারদেরকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন; সমাজ পরিত্যক্ত ননীবালাকেও ঘরে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর দেবতা ছিল মানুষ, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান নয়। মুসলমান চামারদের ঘরে আহারের নেমন্তন্ন করলে সংস্কারবাদী ভাই এবং সমাজ আপত্তি করলে, তিনি বলেন :

> আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। ···তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোন দেবতা তাহা পারে না। ··· তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুশি হইতে।[৩৭]

জগোমোহনের কথার মধ্যদিয়েই য়ুরোপীয় কর্ম-প্রধান Humanism এর সামাজিক প্রতিফলন ঘটেছে। সামন্ত-সমাজের মধ্যে পারিবারিক, বৈষয়িক বিষযে কুটিল, ফাঁকা কৃত্রিম হিন্দুয়ানী চর্চার যে একটা স্রোত ছিল, হরিমোহন এবং তার ছেলে পুরন্দর-এর মধ্যে দেখা যায় তারই ধবনি-প্রতিধ্বনি। 'হরিমোহন তো মুরগী খাইয়া লোক সমাজে সেটাকে পাঁঠা বলিয়া পরিচয় দিলেও ··· সহ্য করিতেন।' জগমোহন-শচীশের ধর্মহীনতার প্রধান প্রতিবাদী পুরন্দরই বিধবা ননীবালার অন্তসত্ত্বা ও মৃত্যুর জন্য দায়ী।

লীলানন্দ স্বামী এবং শিষ্য শচীশের মধ্যদিয়ে গত-শতাব্দীর নব্য হিন্দু-সমাজের তথাকথিত বৈষ্ণবতারই প্রকাশ ঘটেছে। ভাব-সাধকদের কাছে প্রেম-প্রীতি-কর্তব্য-বোধের কোন অস্তিত্ব নেই। দামিনীর জীবন-পূর্ণ আহ্বানকে পদাঘাত করতেও শচীশ কুণ্ঠিত হয়নি। শ্রীবিলাসের মধ্যে যুগানুগ মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর বিপরীতমুখী চিন্তার দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। শচীশ প্রথম জীবনে ছিল নাস্তিক, লীলানন্দ স্বামীর সংস্পর্শে এসে হল ঘোরতর বৈষ্ণব — প্রকৃতির কঠিন আঘাতে সঠিক পথকে সে আবিষ্কার করতে পারল। শচীশের মধ্যদিয়ে গত শতকের শিক্ষিত সমাজের বিপর্যস্ত আধ্যাত্মিক (সত্যকে সঠিক রূপে আবিষ্কার করার আত্মক্ষয়ী প্রয়াসের) সত্যই রূপায়িত হয়েছে। চতুরঙ্গ রচনাকালে দেশ-কালের নিকট বিধবা-বিবাহ হয়েছে সমর্থিত, মূক মোহিনী'র প্রত্যাশা চতুরঙ্গে দামিনীর মধ্যে বিনা-বির্তকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

গ.

চতুরঙ্গের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরে-বাইরে উপন্যাসে আবার জাতীয়, রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক আলোড়নের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেন। দেশ-কালের যে গুরুতর দিকটি ঘরে-বাইরে উপন্যাসে প্রতিফলিত হল — সে দিক নিয়ে কোন

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের পূর্বে চিন্তা করেন নি। ঘরে-বাইরের বিষয়টি যেমন জাতীয় জীবনের বিভ্রান্তিকর সত্য, তেমনি উপন্যাসের আলোচনা সমালোচনার ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি এনেছে।

গোরার দেশ-কালের স্বরূপ আলোচনার সময় আমরা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেছি কি ভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত-মানসে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব অতিদ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং মধ্যবিত্ত সমাজ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিজেদের নিয়োগ করেছে। স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তা যুগ্মভাবেই তখন ইংরেজ-শাসন-বিরোধী আন্দোলনে পর্যবেসিত হয়েছে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) আগে 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন'ই ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা এবং বক্তব্যকে কোন পরিকল্পনায় রূপ দিত। ইতিমধ্যে 'ইলবার্ট বিল' আন্দোলন শুরু হয়।[৭০] ভারতীয় দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়, সুরেন্দ্রনাথ জেলে গেলেন। এই ব্যর্থতার পরই আত্মশক্তির তাগিদেই (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) ন্যাশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। পুনরায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আর একটি অনুরূপ কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে, বোম্বাইয়ে, কংগ্রেসের জন্ম হয়।

এদিকে হিন্দু-জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমশঃই সংকীর্ণ হিন্দুত্বের কুক্ষিগত হতে চলেছে। শিবাজী উৎসব, গণপতি মেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে হিন্দু-মানসের সংকীর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে, রাজনৈতিক চেতনাকেও তেমনি একাগ্রভাবে আন্দোলনমুখী করে তুলেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য দেশের নিম্ন-শ্রেণীর দরিদ্র-হিন্দু একে সমর্থন করেছিল, ধর্মীয় কারণে; অর্থনৈতিক মুক্তি চেতনার মুক্তবুদ্ধি থেকে নয়। কারণ ততখানি সাংগঠনিক বাস্তববাদী-প্রয়াস শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দু-জাতীয়তাবাদী নেতাদের থাকার কথা নয়। এটাই ইতিহাসের ধারা। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে নানা কারণে সাধারণ মুসলিম-সমাজ এই উগ্র হিন্দু-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরিপূর্ণ ভাবে যোগ দিতে পারেনি।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর অধিকাংশ বাঙালীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েই সাময়িক ভাবে হিন্দু-মুসলমানের রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।[৭১] ভারতসচিবের দ্বারা বঙ্গচ্ছেদ অনুমোদিত হবার দশদিন পরে সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ১লা আগষ্ট প্রকাশ্যে বয়কট বা বিলাতী বস্ত্রাদি বর্জন প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। ছয় দিন পরে ৭ই আগষ্ট (১৯০৫) টাউন হলের বিরাট জন সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হলে বয়কট আন্দোলন দেশ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। কাশীর কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯০৫) গোপালকৃষ্ণ গোখলের সভাপতিত্বের মধ্য দিয়ে স্বদেশী ও বয়কটনীতি অনুমোদিত হয়। ফলে, অনতি বিলম্বে

বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ সর্বপ্রথম একটি ব্যাপক কার্যকরী আন্দোলনে প্রবেশ করল। ফলে নিষ্ঠুর স্বরূপ প্রকাশ পেল বৃটিশ শাসক শ্রেণীর। স্যার হার্বাট রিজলি সাহেব, একটি সার্কুলারের মধ্যদিয়ে ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই সূত্র থেকেই পরবর্তীকালে আইন অমান্য আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের ভূমিকা ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে। তবুও কয়েকটি মূল-ভ্রান্তির জন্যই তা ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ মধ্যবিত্ত সমাজের সুবিধা-আদায়ী আকস্মিক আন্দোলনের অন্তরালে কোন গণ-সংগঠন ছিল না। এদিকটা তাঁরা উপলব্ধি করার প্রয়াসী হননি।

> বঙ্গচ্ছেদ রদ করিবার জন্যই আন্দোলনের প্রয়োজন — এই ছিল এক শ্রেণীর লোকের মত, বঙ্গচ্ছেদ রদ হইতেছে না বলিয়া ইংরেজকে জব্দ করিবার জন্যই বয়কট বা বিলাতী দ্রব্য বর্জনই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। সেই সময়ে এক প্রকার প্রতিজ্ঞা-পত্রে লিখিত হইত, যতদিন বঙ্গচ্ছেদ রদ না হয়, ততদিন বিলাতীদ্রব্য বর্জন করিব।[৭২]

সুতরাং সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা যায়, এই স্বদেশী আন্দোলনের বয়কট নীতির জন্ম যত না অর্থনৈতিক আন্দোলনের উপরে ভিত্তি করে তার চেয়েও পরিপূর্ণ ভাবে ছিল আত্মমর্যাদার পরে নির্ভরশীল। বঙ্গভঙ্গ রদটাই এ-আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে সম্পূর্ণভাবে নেতারা পরিচ্ছন্ন ছিলেন না।[৭৩] কংগ্রেসের মতানৈক্যের অন্তরালে এই কারণ সুক্ষ্মভাবে প্রবাহিত ছিল। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের জন্ম হয় এই বিভ্রান্তিকর আবর্ত থেকে।

স্বদেশী আন্দোলনের রূপ এবং কার্যক্ষেত্রের প্রতিক্রিয়া প্রভাত মুখোপাধ্যায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। বাস্তব কারণই স্বদেশী আন্দোলনকে পরাজয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। বিভিন্ন কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — সংগঠনের অভাব এবং দরিদ্র জন-সাধারণ সম্পর্কে নেতাদের অজ্ঞতা ঃ

> দেশ মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণবেগে চলিতেছে। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে বিরাট জনসভা আহ্বান করিয়া বিলাতী বস্ত্র, লবন, চিনি ও মনোহারী সামগ্রী বর্জন করিবার জন্য সকলকেই উৎসাহিত করা হইতে লাগিল। এই সকল বক্তৃতা সর্বদা ভাবালুতা বর্জিত হইত না এবং বৈজ্ঞানিক বা অর্থ-নৈতিক যুক্তিধারা আশ্রয়ী হইত না। সস্তায় সুন্দর মসৃণ বিলাতী বস্ত্রের স্থানে মহার্ঘ্য মোটা বোম্বাই কাপড় ক্রয় করিতে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রায়ই

> অনিচ্ছা দেখা যাইত। দেশ কি, ইংরেজ কোথায়, কাহাকে অত্যাচার অপমান করিতেছে ইত্যাদি কথা তাহাদের নিকট অত্যন্ত অস্পষ্ট। বরং তাহারা দেখে, জমিদার মহাজন ও বর্ণহিন্দুর অত্যাচার হইতে তাহাদের রক্ষা করে ইংরেজ শাসক বা তাহারই অধীনস্থ শিক্ষিত কর্মচারীরা। জনতার নিকট ইংরেজ শোষক, ইংরেজ লুণ্ঠনকারী ইত্যাদি বাক্য সম্পূর্ণ অর্থশূন্য — তাহারা দেখিতেছে তাহাদের শোষণ করিতেছে তাহাদের পাইক পেয়াদা। তাহাদের অস্থিমজ্জা সার করিতেছে গ্রামের সুদখোর হিন্দুমহাজনরা ও ভ্রাম্যমান মুসলমান কাবুলীরা। ইংরেজ কোথায়?[৭৪]

ফল হোল, সেচ্ছাসেবকগণ অনুনয় করে সফল না হলে ক্রেতাদের এবং বিক্রেতা-দের উপর জুলুম ভয়ভীতি প্রদর্শন করত, অত্যাচার করতেও দিরুক্ত হতনা। অন্যদিকে বোম্বাই আমেদাবাদের মিল-মালিকরা রয়কট আন্দোলনের ফলে রাতারাতি ধনী হয়ে উঠল। অপর পক্ষে বাংলার অধিকাংশ মুসলমানগণ ছিলেন দরিদ্র। ফলে অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণে (যেহেতু হিন্দু-মধ্যবিত্ত সমাজের আন্দোলন ছিল হিন্দুধর্মের উপর সম্পূর্ণই ভিত্তিশীল) মুসলমানগণ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ না দেওয়ায় কলহ উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হল।[৭৫] বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই এর সূত্রপাত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধাবলীতে,[৭৬] পাবনার অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে[৭৭] এর সামজিক, অর্থ-নৈতিক কারণ এবং এ-সমস্যার সমাধান হিসাবে একটি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য দেশ নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি নিজেও পাবনার অধিবেশনে একটি কর্ম-পদ্ধতির খসড়া উপস্থিত করেন।

উল্লিখিত দেশকালের পটভূমি থেকে ঘরে-বাইরের কাহিনী অংশ নির্বাচিত হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেন নি, সমকালীন জীবনের বিক্ষুদ্ধ পরিবেশ এবং মানসিকতা থেকে তাঁর বক্তব্যের প্রয়োজনানুগ অংশটুকুই নির্বাচন করেছেন। সন্দীপ স্বদেশী যুগের বিচিত্র মানসিকতা সম্পন্ন সেচ্ছাসেবক এবং নেতাদের মধ্যে একজন। তাঁর মানসিকতার মধ্যে বৃহৎ সমাজ-কল্যাণ-বোধ যতনা জড়িত, তার চেয়ে অধিক এবং প্রায়-সম্পূর্ণ ভাবেই রয়েছে মধ্যবিত্ত-চিত্ত-সুলভ ব্যক্তিভোগ-পরায়ণতা। ইংরেজ চরিত্রের অতিভোগবাদ তাকে আকৃষ্ট করেছে; তার বিশ্বাস এ-পৃথিবীতে ভোগবাদী এবং শাক্ত-নীতির জন্যেই ইংরেজ আজ পৃথিবীর অধিশ্বর।

পরাধীনতা একটা প্রতিক্রিয়া মানসপ্রবাহের উপর সৃষ্টি করবেই—এটা তার চরিত্র। আত্মঅবমাননার ক্ষালন করতে স্বাধীনচেতা মানুষ, প্রয়াসী হয়; কিন্তু উত্তেজনা, যন্ত্রণার মধ্যদিয়ে অনেক সময় বিকৃত মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনের সুস্থ পরিবেশ সন্দীপের ছিল না, এটি সমকালীন একটি শ্রেণী লক্ষণ, সন্দীপেরও লক্ষণ। সন্দীপের অতি আন্তরিক বস্তুবাদী (অনেকাংশে অসুস্থ) জীবনার্থ হোল :

> না, আমি লজ্জা করিনে। যা দরকার আমি চেয়ে নিই, না চেয়েও নিই। লজ্জা করে যারা নেবার যোগ্য জিনিস নিলে না তারা সেই না নেবার দুঃখ-টাকে চাপা দেবার জন্যেই লজ্জাটাকে বড়ো নাম দেয়। এই যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি এ হচ্ছে রিয়ালিটির পৃথিবী। কতকগুলো বড়ো কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে খালি পেটে খালি হাতে যে মানুষ এই বস্তুর হাট থেকে চলে গেল সে কেন এই শক্ত মাটির পৃথিবীতে জন্মে ছিল। আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দলব, সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যাক্ত খাঁটিয়ার ছারপোকার মতো একেবারে পাংলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চী চী গলার ভৎর্সনা আমার কানে পৌছুবে না।[৭৮]

বিমলা চরিত্রের মধ্যে সমালোচকগণ অনেক নীতিবোধের এবং নীতিচ্যুতির সন্ধান করেছেন। তবে সেটা ঔপন্যাসিকের জীবনার্থের সংগে জড়িত হবার পরের কথা। স্বদেশী যুগের সামাজিক আলোড়ন কেবলমাত্র দেশের যুবক-পুরুষদেরই রক্তে উন্মাদনা তুলেছিল তা নয়, সেদিনের কুমারী বিবাহিতা নারীগণও ঘরের চার দেয়াল ছেড়ে দেশের মাঝে নেমে এসেছিল।[৭৯] ঘরে-বাইরের মধ্যেই এর ইঙ্গিত রয়েছে :

> বাংলা দেশে একদিন স্বদেশীর যুগ এসেছিল। নূতন যুগ একেবারে বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো আমাদের ভয় ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কী হল, কী হবে বোঝবার সময় পাইনি। পাড়ার বর আসছে, তার বাঁশি বাজছে, তার আলো দেখা দিয়েছে, অমনি মেয়েরা যেমন ছাতে বারান্দায় জানালায় বেরিয়ে পড়ে, তাদের আবরণের দিকে আর মন থাকে না[৮০]

তেমনি ভাবে সেদিনের বাঙলার মেয়েরা জাতীয় আলোড়নের মধ্যে নেমে এসেছিল। বিমলাও তাদের একজন। স্বদেশী আন্দোলনের অভিঘাতে দেখা দিল

একটি পারিবারিক বিভ্রান্তি। হঠাৎ-ধাক্কার প্রবল স্রোতে আলোড়িত বিভ্রান্তিকর মানসিকতার একটি রূপ-প্রকাশ বিমলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরদিনই ঘটনার চেয়ে বিচিত্রমুখী প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ আঁকতে উৎসাহী, বিমলা সেই শিল্পদৃষ্টির বহু প্রশ্নবিদ্ধ একটি চরিত্র। স্বদেশী আন্দোলনের ঘটনাগত দিক অধিকতর বাস্তব ভাবে, নিরাসক্ত রূপে প্রকাশ পেয়েছে পঞ্চুর জীবনালখ্যের এবং হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ইঙ্গিতের মধ্যে।

ঘরে-বাইরে থেকে উদ্ধৃত নিম্নাংশটুকু লক্ষ্য করিলেই — স্বদেশী যুগের বয়কট-নীতির ফলে দরিদ্র জন-সাধারণের সমস্যা[৮১] কি মর্মান্তিক হয়েছিল স্পষ্ট হবে।

> ও (পঞ্চু) বিলিতি কাপড় বেচেছে। ও জমিদারকে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বললে, পরের কাছে ধার করা টাকার কাপড় ক'খানা কিনেছে, এইগুলো বিক্রি হয়ে গেলেই ও এমন কাজ আর কখনো করবে না। জমিদার বললে, সে হচেছ না, আমার সামনে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্, তবে ছাড়া পাবি। ও থাকতে না পেরে হঠাৎ বললে, আমার তো সে সামর্থ্য নেই, আমি গরিব; আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। শুনে জমিদার লাল হয়ে উঠে বললে, হারামজাদা, কথা কইতে শিখেছ বটে। লাগাও জুতি! এই বলে এক চোট অপমান তো হয়েই গেল, তারপরে এক শো' টাকা জরিমানা।[৮২]

সংগঠনের দুর্বলতার জন্যই যে হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র জনসাধারণ স্বদেশী আন্দোলনকে গ্রহণ করতে পারেনি, এরও চিত্র ঘরে-বাইরের মধ্যে দুর্লক্ষ্য নয়। ছাত্রবৃন্দ এবং নিখিলেশ-চন্দ্রনাথবাবুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে। স্বদেশীরা যে অর্থের প্রয়োজনে ডাকাতি পর্যন্ত করত এ সত্যও আলোচিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাতের জন্য বয়কট নীতি প্রয়োগের প্রত্যক্ষ জবরদস্তি বর্তমান ছিল। সন্দীপের প্রতি আক্রোশই তাদের প্রধান ঃ

> আমার সময় নেই, নিখিল। খবর পেয়েছি, মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মত লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুতে রাখবার মতলব করেছে।[৮৩]

পঞ্চুকে জরিমানাকারী জমিদার হরিশকুণ্ডুর কাছারীলুঠ এবং অমূল্যের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে যে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছিল — গভীর অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সূত্রে ঘরে-বাইরের মধ্যে তার চিত্র স্থাপিত হয়েছে। দেশ-কালের এমন নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষ সত্য বাংলা সাহিত্যের খুব কম উপন্যাসেই প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ.

যোগাযোগ কোন রাষ্ট্রনৈতিক আলোড়ন বা ধর্মকেন্দ্রিক বিপর্যয় এবং সংঘাতের প্রেক্ষিতে রচিত হয়নি। অথচ গত শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাজ সত্যের পরিমণ্ডলে এর ঘটনাংশ বিস্তৃত। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের মধ্য থেকে কিভাবে বণিক-সমাজ ও ধনবাদী-সমাজের মূলধন সঞ্চিত হয়ে ক্রমশঃ সমাজ শিল্প-বিস্তারের দিকে পদক্ষেপ নিচ্ছিল—অতি নিপুণ ভাবে যোগাযোগ উপন্যাসে এ সত্য রূপায়িত হয়েছে। এ উপন্যাসের মানুষেরা সেই যুগের যেখান থেকে প্রাচীন কাল সরতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু নবীনযুগের আসন এখনো পাতা হয়নি।[৮৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই বাঙালী ধনিকশ্রেণী অতি মন্থর ও বঙ্কিম গতিতে বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। সামন্ত সমাজ থেকে ধনবাদী সমাজে প্রবেশের প্রথম শর্ত হোল মূলধন সঞ্চয়। ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপী আমাদের ধনীক-শ্রেণীকে এই মূলধন সঞ্চয়ের স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। কারণ বৃটিশ বুর্জোয়া-শ্রেণী তাদের বাজারের জন্য — এ দেশের শিল্পোদ্যোগী ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা দেয় নি। কিন্তু পক্ষান্তরে এদেশে শাসনক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এদেশের নতুন জমিদার শ্রেণীর এবং উদীয়মান ধনীক-শ্রেণীর আনুগত্য তাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল।[৮৫] বাংলার ধনীক-শ্রেণীর উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ এদেশে বৃটিশ পুঁজিপতিদের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। কোম্পানীর ক্ষমতা হ্রাসের জন্য পার্লামেণ্ট, ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড নথের 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' ও ১৭৮৪ সালে 'পিটের ইণ্ডিয়া আইন' ঘোষণা করে। অবশেষে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে কোম্পানীর একচেটে ব্যবসার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল।[৮৬] ফলে এ দেশের উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা যারা প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এজেন্সী-হাউসগুলির দেওয়ানী মুৎসদ্দীগিরি করতো, এখন তারা বড় বড় বৃটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান ও এজেণ্ট নিযুক্ত হতে লাগল। এই দেওয়ানী-দালালি, বেনিয়াগিরি ও এজেণ্টের কাজে তাঁরা প্রভূত ধন-সঞ্চয় করতেন।[৮৭]

অপর দিকে বৃটিশ পুঁজিপতিদের অবাধ-ব্যবসায়ের অধিকার দেবার ফলে বাংলার গ্রামীন শিল্প সম্পূর্ণই ধ্বংস হোল ; এবং কলকাতায় শিল্পের পতন হতে শুরু করল। ১৮৩৩-এ বাংলায় পোত, গমপেষা যন্ত্র (১৮২৯—৩০) প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হোল। চটকল (১৮৫৩), রেলপথ ও টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা হল — বিলাতী পণ্যের বাজার ভারতে প্রসারিত হতে লাগল।[৮৮] বৃটিশ-শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচাদ্রব্য রপ্তানী ও বিলাতী দ্রব্য

আমদানী এবং নীলের ব্যবসা-সংক্রান্ত সুবিধার জন্য ১৮৫০ এর পর থেকে বাঙালী পরিচালিত ৯টি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায় :

আশুতোষ দে এ্যাণ্ড কোম্পানী
রাম গোপাল ঘোষ এ্যাণ্ড কোম্পানী
মতিলাল মল্লিক এ্যাণ্ড কোম্পানী
রাধানাথ দত্ত এ্যাণ্ড কোম্পানী
কে মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানী ইত্যাদি।[৮৯]

সুতরাং সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী ধনবাদী-সমাজ অঙ্কুরিত হয়ে গেছে। তবে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অভিঘাত তুলতে পারেনি। এখানে উল্লেখযোগ্য, কর্নোয়ালীসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী ক্রয় করবার নগদ মুদ্রা যাদের ছিলনা, তারা জমিদারী হারাল, কেউবা পুরান জমিদারীর ভগ্নাংশ নিয়ে জীবন নির্বাহ করতে লাগল। ফলে গত শতাব্দীর সমাজ বিকাশের সূত্র-নির্দেশ করে বলা চলে এটা সামন্ত সমাজের বিলীয়মান ও ধনবাদী সমাজের পূর্বরূপ বণিক-শ্রেণীর উদীয়মান কাল। উল্লিখিত সমাজ বিবর্তনের রূপই 'যোগাযোগ' উপন্যাসের মধ্যে দেশ-কালের পটভূমি হিসাবে উপস্থিত। মধুসূদনের জীবনের প্রতিষ্ঠা অর্জনের স্তরগুলি লক্ষ্য করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

> মধুসূদনের বাপ আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়তদারদের মুহুরি। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সংসার চলে। মফস্বল স্কুলের মধুসূদনের প্রথম শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষা ছিল নদীর ধারে, আড়তের প্রাঙ্গনে, পাটের গাঁটের উপর চ'ড়ে বসে। যাচনদার খরিদ্দার গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের ভিড়ের মধ্যেই তার ছুটি, যেখানে বাজারে টিনের চালা ঘরে সাজানো থাকে সারবাঁধা গুড়ের কলসী, আঁটিবাধা তামাকের পাতা, গাঁট বাঁধা বিলিতি র‍্যাপার, কেরোসিনের টিন, সরষের ঢিবি, কলাইয়ের বস্তা, বড়ো বড়ো তৌল দাঁড়ি আর বাটখারা. সেইখানে ঘুরে তার যেন বাগানে বেড়ানোর আনন্দ।...

ছাত্র মহলে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বই বিক্রি করে ব্যবসা হল শুরু।... [৯০]

> তার প্রধান ছাত্র-বন্ধু ছিল কানাইগুপ্ত। (তিনি) নিজের থেকে টাকা ডিপোজিট দিয়ে মধুকে রজবপুরে কেরোসিনের এজেন্‌সিতে বসিয়ে দিলেন। সৌভাগ্যের দৌড় শুরু হল ; সেই যাত্রা পথে কেরোসিনের ডিপো কোন্ প্রান্তে

> বিন্দু আকারে পিছিয়ে পড়ল। জমার ঘরের মোটা মোটা অঙ্কের উপর পা ফেলতে ফেলতে ব্যবসা হুহু করে এগোল গলি থেকে সদর রাস্তায়, খুচরো থেকে পাইকিরিতে, দোকান থেকে আপিসে ...।[৯১]
>
> এবারও মধুসূদনের হিসেবে ভুল হল না। দেখতে দেখতে রজবপুরে ব্যবসার একটা আওড় লাগল। তার ঘুর্ণিটানে দালালরা এসে জুটল, এল মাড়োয়ারির দল, কুলির আমদানি হল, কল বসল, চিমনি থেকে কুণ্ডলায়িত ধূমকেতু আকাশে কালিমা বিস্তার করল।[৯২]

এভাবেই মধুসূদন 'ঘোষাল-কোম্পানির' মালিক। সুতরাং মধুসূদনের জীবন-প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের মধ্য দিয়েই গত শতাব্দীর ধনীক শ্রেণীর উন্মেষের ঐতিহাসিক সত্যই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

বিপ্রদাস-এর জীবন বর্ণনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-সমাজের সামাজিক রূপ ও বিলুপ্ত হবার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

> নূরনগরের চাটুজ্যেদের অবস্থা এখন ভালো নয়। ঐশ্বর্যের বাঁধ ভাঙছে। ছয়-আনি শরিকরা বিষয় ভাগ করে বেরিয়ে গেল, এখন তারা বাইরে থেকে লাঠি হাতে দশ-আনির সীমানা খাবলে খাচেছ।[৯৩]...
>
> পুরোনো ধনী-ঘরে পুরাতন কাল যে-দুর্গে বাস করে তার পাকা গাঁথুনি। অনেক দেড়ড়ি পার হয়ে তবে নতুন কালকে সেখানে ঢুকতে হয়। সেখানে যারা থাকে নতুন যুগে এসে পৌঁছোতে তাদের বিস্তর লেট হয়ে যায়। বিপ্রদাসের বাপ মুকুন্দলালও ধাবমান নতুন যুগকে ধরতে পারেন নি।[৯৪]

পুরাতন কালের — সামন্ত জমিদারদের প্রথামতো মুকুন্দলালের জীবন দুই মহলা। এক মহলে গার্হস্থ্য, আর এক মহলে 'ইয়াকি' 'অকর্ম'। আভিজাত্য প্রমাণের সকল প্রকার দান-ধ্যান, পূজাপার্বণ, অতিথি সৎকার এবং নির্জলা বিলাস-আমোদের মধ্য দিয়ে তাঁর মৃত্যু হল।

> বাবার মৃত্যুর পর বিপ্রদাস দেখলে, যে গাছে তাদের আশ্রয় তাঁর শিকড় খেয়ে দিয়েছে পোকায়। বিষয় সম্পত্তি ঋণের চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে অল্প করে ডুবছে। শেষকালে নূরনগর থেকে বাসা তুলতে হল। কলকাতায় বাগ বাজারের দিকে একটা বাড়ীতে এসে উঠল।[৯৫]

ঘোষাল-বংশ এবং চাটুজ্যে বংশের পুরাকালে আত্মমর্যাদা ও ক্ষমতার লড়াই বেঁধে

ছিল। তারই জন্য পথে বসতে হয়েছিল ঘোষাল-বংশকে। মধুসূদনের বাপকে করতে হয়েছিল মুহুরিগিরি। বংশের সেই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নতুন কালে, নতুন সমাজ-বিন্যাসে — নতুন করে শুরু হল — মধুসূদন এবং বিপ্রদাসের মধ্যে। নতুন ধনীক ব্যবসায়ী মধুসূদন, আর ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রতিনিধি বিপ্রদাস। বিপ্রদাসের ছোট বোন কুমুকে কেন্দ্র করে এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বের নবতর প্রকাশ।

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-সমাজের সংগে নব উদ্ভূত ধনীক ব্যবসায়ী শ্রেণীর এই দ্বন্দ্ব, সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সত্য। 'যোগাযোগে' এই মর্যাদা বোধের প্রতিযোগিতা সুস্পষ্ট হয়েছে কয়েকটা চিত্রের মধ্যে।

> মাঝে একটি ছোটো বাঁধানো জলাশয়, তারইমধ্যে লোহার ঢালাই করা নগ্ন স্ত্রীমূর্তি ···। এদিকে ঝকঝকে চাপরাস ঝোলানো হলদের উপর লালপাড় দেওয়া পাগড়ি বাঁধা, জরির ফিতে দেওয়া লাল বনাতের উর্দিপরা চাপরাসির দল বিলিতি জুতো মস্‌মসিয়ে বেড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করে, দিনরাত প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজায়, তাদের কারও কারও চামড়ার কোমরবন্ধে ঝোলানো বিলিতি তলোয়ারটা জমিদারের মাটিকে পায়ে পায়ে খোঁচা দিতে থাকে। চাটুজ্যেদের সাবেক কালের জীর্ণ সাজপরা বরকন্দাজেরা লজ্জায় ঘর হতে বার হতে চায় না।··· নূরনগরের পাঁজরটার মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়ে শেল দণ্ডের উপর আজ ঘোষালদের জয়পতাকা উড়েছে।[৯৬]

সামন্ত সমাজের প্রতীক চাটুজ্যে বংশের হাতি যখন 'বিনা কারণে ঘোষাল দিঘির সামনের রাস্তায় শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে তারা টহলিয়ে' বেড়ায়, তখনই মধুসূদন বিপ্রদাসের বজরা প্রত্যাখ্যান করে অতি দ্রুত ষ্টিমলঞ্চে মধুপুরীর দিকে আসছে। যোগাযোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ-কাল বোধের স্রোত সমাজ বিবর্তনের সত্য রূপ রূপায়ণের খাতে প্রবাহিত।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সমাজ সংঘাত এবং বিবর্তনের সঙ্গে ভাব সংঘাত এবং মানস প্রবাহের বিবর্তন অঙ্গাঙ্গিভাবে সংলগ্ন। যে কোন সমাজ সংঘাতের কালে মানস প্রবাহ, জীবনার্থ এবং মূল্যবোধের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই দেশ-কালের সমাজ সত্য ও ভাব সত্যের সমন্বিত শিল্পরূপ দেওয়া। চিরদিনই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘটনার চেয়ে ঘটনা-সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া, মানস-দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে মানসিকতার ক্রমবিকাশ প্রভৃতি বর্ণনার দিকে অধিকতর উৎসাহী। যোগাযোগ উপন্যাসে মধুসূদন-বিপ্রদাস-কুমুদিনী কেন্দ্রিক দ্বন্দ্বটি উত্থিত হয়েছে দেশ

কালের আলোচিত বাস্তব অবস্থা থেকে ; সেই দ্বন্দ্বের সম্ভাব্যতা এবং স্বরূপ বিশ্লেষণেই রবীন্দ্র প্রতিভার গৌরব। অন্যভাবে বলা চলে, দেশ-কালের ভাবসত্য, বৈচিত্র্য, দ্বন্দ্ব এবং তার ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিক ট্রাজিডি অঙ্কনই যোগাযোগে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-বোধের সার্থকতা।

৬

চতুর্থ বা সর্বশেষ পর্যায়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা (১৯২৯)[৯৭], দুই বোন (১৯৩৩)[৯৮], মালঞ্চ (১৯৩৪)[৯৯], এবং চার অধ্যায় (২৯৩৪)[১০০]। এই পর্যায়ের উপন্যাসের শিল্পগত একটি ঐক্য আছে ঠিকই তবে ঘটনাংশের প্রেক্ষিতে একটু পার্থক্য আছে। শেষের কবিতা, দুই বোন, মালঞ্চ এই ত্রয়ী উপন্যাসের পটভূমি বাঙলা দেশের কোন উত্তেজনাকর, আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রত্যক্ষ দেশ-কাল সত্যের উপর অধিষ্ঠিত হয়। এর ঘটনাংশ এবং চরিত্রগুলি এদেশের আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে চার অধ্যায়ের পটভূমিও মধ্যবিত্ত সমাজ।

শেষের কবিতা-দুই বোন-মালঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক বিত্ত এবং বিদ্যাধারী মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই যেমন চরিত্রাংশ, তেমনি ভাবলোকও গ্রহণ করেছেন। উক্ত ত্রয়ী উপন্যাসে ঔপন্যাসিক — আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্র-মুখী মানসিকতা, মানসিক-সমস্যাকে রূপায়িত করেছেন। শেষের কবিতায় সমসাময়িক সাহিত্যের ও সমাজের ফ্যাশনের সমালোচনা আছে। 'তবে শ্লেষ গোড়ার দিকে যতটা ঝাঁঝালো শেষের দিকে ততটা নয়। সেখানে উগ্রতা কমে গিয়ে মানবতা ও সহৃদয়তা ফুটেছে।'[১০১] অমিত, লাবণ্য, কেটি, লিসি, নরেন, লিলি সকলেই উচ্চশিক্ষিত, জীবন-বিন্যাসে পাশ্চাত্যানুসারী — তাদের হৃদয়ের বহু বঙ্কিমতা, বৈচিত্র্য, মনস্তত্ত্বই শেষের কবিতার দেশ-কালোচিত সমাজবিধৃত ভাবসত্য।

দুই বোন-মালঞ্চ—মধ্যবিত্ত সমাজের পারিবারিক জীবনের হৃদয়-দ্বন্দ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। দুই বোনের শর্মিলা বাস্তব সমস্যার সমাধান করেছে আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে। শশাঙ্কর মানসিকতার বিপর্যয় বাস্তবানুগ ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। তবে সমাজ সত্যের একটি শক্তিশালী রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে মালঞ্চের মধ্যে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং মর্ত্য-প্রীতির বাস্তব করুণ পরিণতি ঘটেছে মালঞ্চের নীরজার মধ্যে। সে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। স্বামী আদিত্য নীরজার অসুস্থতার কারণে বাল্যবন্ধু সরলাকে বাগানের

কাজে সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করেছে। স্ত্রী নীরজার ঈর্ষা, সন্দেহ এবং সরলা-আদিত্য প্রসঙ্গে দাসীর কাছ থেকে সকরুণ সংবাদ সংগ্রহ করে সঙ্কুচিত হবার মধ্যে বিশ-শতকের জীবন যন্ত্রণার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। চেতনা প্রবাহকে অস্বীকার করার চেষ্টা নীরজা করেছে কিন্তু মনের অদম্য কামনাকে বিসর্জন দিতে পারেনি। বারবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে সরলার কাছেই স্বামীকে তুলে দেবে। কিন্তু নিষ্ঠুর মর্ত্য ও জীবন তৃষ্ণা তাকে শর্মিলার মতো হতে দিল না। নীরজা তার স্বামীকে কোন ধর্ম বা নীতি কথার জোরে হারাতে পারে না, শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী আত্মদ্বন্দ্বে নিষ্পেষিত হয়ে নীরজা সরলাকে ডেকে পাঠালো, নীরজার মৃত্যু আসন্ন—আদিত্যকে তার হাতেই সে দিয়ে যাবে। কিন্তু

> সরলা এসে প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত আপনি গেল সরে। ভাঙা গলায় বলে উঠল, পারলুম না, পরলুম না, দিতে পারব না পারব না। ... চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল, বললে জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।
>
> হঠাৎ ঢিলে সেমিজ পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, পালা পালা পালা এখনি নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।
>
> বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।[১০২]

গলার শব্দ শুনে আদিত্য ছুটে ঘরে এল, প্রাণের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে ফেলে দিয়ে নীরজার শেষ কথা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। জীবনের প্রতি এত আগ্রহে, স্বীয় অধিকারের প্রতি এমন নির্মম আন্তরিকতায় — রবীন্দ্রসাহিত্যে নীরজার মত চরিত্র আর একটিও নেই। যে সুকঠিন আত্ম-প্রীতি, মর্ত্যপ্রীতি থেকে রেনেসাঁসের জন্ম তারই নিষ্ঠুর বাস্তব প্রকাশ নীরজার মধ্যে। বিশ-শতকী জীবনাগ্রহের তীব্রতাকে ধারণ করেছে মালঞ্চ।

অসহযোগ আন্দোলনের পরেই বাংলা দেশে নতুন করে যে বিপ্লব প্রচেষ্টা দেখা দেয় চার অধ্যায়-এ তারই তত্ত্ববিশ্লেষণ এবং নিরপেক্ষ-মূল্য নির্ধারণ করতে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন একথা যথাযথ নয়। বস্তুত দেশের কাজ যত মহৎই হোক না কেন তাতে যদি মানুষের আত্মপ্রসারণ বাধা পায়, তার আত্মমর্যাদা নষ্ট হয় তবে ব্যক্তি জীবনের পক্ষে তা নিতান্ত অমঙ্গল জনক, এবং মহৎ ব্যক্তি-জীবনের মূল্য সবার উপরে। এই চার-অধ্যায়ের বক্তব্য বিষয়। রবীন্দ্রদৃষ্টি সম্পর্কে এমনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ত

যথেষ্ট আশঙ্কা জনক। রবীন্দ্রনাথ চার-অধ্যায়ের মধ্যে একটি সার্বভৌমিক মতাদর্শ প্রচার করেছেন বলে মনে হয় না। আসল কথা, বিপ্লববাদ বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট বহুমুখী প্রতিক্রিয়া এবং সমস্যার মধ্যে চার-অধ্যায় প্রসারিত। এই সমস্যা-উত্থিত মানসিকতা এবং তার ট্রাজিক পরিণতি বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্প প্রেরণা পেয়েছেন।

ভারতের মধ্যে ইংরেজদের প্রভুত্ব ধ্বংস করবার জন্য উনবিংশ শতকের শেষাব্দে রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের প্রচেষ্টায় সঞ্জীবনী সভার কাজ কর্ম ম্যাৎসিনি (১৮০৫—৭২) সৃষ্ট কার্বোনারী গুপ্ত সংস্থার মত চলতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলিও এই বিপ্লববাদী প্রয়াসের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। বাংলা দেশে ১৯০২ সালে বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা মামুলী-রাজনীতি-চর্চার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিপ্লবী-কর্ম আরম্ভ হয় বিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে। ১৯০৬ সালে বিপ্লবীদের অস্তিত্বের প্রথম আভাস পাওয়া যায়, তবে তা কার্যকরী ভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। প্রথম ব্যাপক প্রকাশ লাভ করে ১৯০৮ সাল থেকে (ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল এই সালের আগষ্ট মাসে)। বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ বারীন্দ্রের নেতৃত্ব একে তরান্বিত করে।

এই কালের পটভূমিতে চার-অধ্যায় রচিত হয়। ইন্দ্রনাথ বিপ্লববাদী আন্দোলনের নেতা। এলা তাঁর সংগঠনে যোগ দেয় দেশের জন্য আত্মবিসর্জন দেবার জন্য। এলার আকর্ষণে অতীন্দ্র আসে এই দলে। একদিকে হৃদয়-বিরোধী সংগঠন, দল; অপর দিকে হৃদয়ের এবং স্বভাব-মানসিকতার আকর্ষণ—এই সংঘাত, দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণার প্রেক্ষিতে চার অধ্যায়ের ঘটনাংশ ও চরিত্র বিস্তৃত।

৪. রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ শিল্পরূপ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে — রবীন্দ্রমানস যথা সম্ভব আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও জগৎ-দৃষ্টি একটি সমগ্রতাবোধ থেকে উৎসারিত। বস্তু এবং বাস্তব জগতের অভিঘাতে উত্থিত প্রতিটি চেতনার সুদূর প্রসারী সামগ্রিক রূপকে অবলোকন করার প্রবণতা রবীন্দ্রমানসের বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রকৃতি-চেতনা সৌন্দর্য-পিপাসা, মানব-কল্যাণবোধ, ধর্মবোধ — কোন খণ্ডিত কার্যকারণ সূত্রে চিহ্নিত নয়। সব কিছুকে মিলিয়ে, একটি সমগ্র ঐক্য সূত্র আবিষ্কারের সাধনাই রবীন্দ্র-প্রতিভার মৌল আত্ম-প্রেরণা। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রযুক্ত বিশ্ব, অসীম ইত্যাদি শব্দগুলি এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে সত্য, অন্যথায় শব্দগত ওজস্বিতা ছাড়া তার কোন পৃথক মূল্য থাকে না।

এই মানসিকতার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (১৯১২), 'নূতন পুরাতন' (১৮৯১), 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' (১৯০১), 'সমাজভেদ' (১৯০১) এই পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি রচনা করতে পেরেছিলেন। এই প্রবন্ধগুলিতে বক্তব্যের যে নিরাসক্ত সুদূর তলাশ্রয়িতা বিদ্যমান সে সম্ভবপর হয়েছিল—তাঁর সমগ্রকে গ্রহণ করার মানসিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। কোন জাতির ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল সামগ্রিক দৃষ্টি।

> তিনি বলতেন, প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক পরিবেশে সমাজ-জীবন ও সমাজ মানসের একটা কেন্দ্র বিন্দু থাকে যা তার প্রাণ শক্তির উৎস। এই প্রাণ শক্তি সকলের ইচ্ছা-আকাংখা আগ্রহ ঐকান্তিকতার সম্মিলিত ফল, সকলের জ্ঞান চিন্তা ও মন-মনন থেকেই তার উৎপত্তি। সমাজ দেহের অভ্যন্তরে যে সকল বিরোধী শক্তি পরস্পরকে লংঘন করে, আঘাত করে, সীমাবদ্ধ করে, পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাদের আত্ম-খণ্ডন সত্ত্বেও এই প্রাণশক্তি একটা অখণ্ডরূপে যুগ জীবনের সামগ্রিকতায় প্রতিফলিত না হয়ে পারে না। ইতিহাসে তো এই গভীর সমগ্রতারই দাম, যে সমগ্রতা শুধু অরণ্যের মধ্যেই আভাসিত[১] ...

একই কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন ঘটনাকে, অনুভূতিকে কার্যকারণ-সম্পর্কহীন বলে ভাবতে পারেন নি ; কোন ব্যক্তিকেই খণ্ডিত করে বিচার করতে পারেন নি। বিস্তৃত জীবনের পটে তাকে বিচার করেছেন। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রমানস এত অধিক সচেতন ছিল যে, মৃত্যু-সংক্রান্ত ঘটনাকেও তিনি সমগ্র দৃষ্টিতে দেখতেন। 'আমি যদি প্রমাণ দ্বারা সন্তোষকে জানতুম তাহলে ভুল জানতুম — আমি তাকে সম্পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা জানি। ···দূরের দৃষ্টিতে যে সমগ্রতা আমরা এক ক'রে দেখতে পাই সেইটাই বড়ো দেখা, কাছের দৃষ্টিতে যে খুঁটিনাটিতে মন আবদ্ধ হয়ে সমষ্টিকে স্পষ্ট দেখতে দেয় না, সেইটেই আমাদের শক্তির অসম্পূর্ণতা।[২] বস্তুত এই দূরের দৃষ্টি এবং কাছের দৃষ্টির সম্মিলিত রূপই রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক-দৃষ্টি গড়ে তুলেছে।

এই দৃষ্টিভংগীর পার্থক্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর পূর্ব-কালীন ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তাঁকে পৃথক করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্যায়ের ধর্মকে জীবনাচরণের নিয়ন্ত্রণী শক্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সেই ধর্মের পটেই মনুষ্য-চরিত্রকে বিচার করেছিলেন, তাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছিলেন উক্ত মানদণ্ডের বিচারে। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশেষ পর্যায়ের কোন জীবনাচরণ-পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন নি, তিনি আকর্ষিত হয়েছিলেন তার শাশ্বত সত্যের দিকে। ভারতীয় জীবনাচরণের ঐক্যবোধই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল — এর অন্তরালে সক্রিয় ছিল সামগ্রিক মানুষের কল্যাণবোধ। অখণ্ড মানবাশ্রয়ী কল্যাণ-বোধের সামঞ্জস্য-বিধানকারী সারসত্যকেই তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্যের জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদী গণ্ডিতে আবর্তিত হয়েছেন — পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়েছেন গণতান্ত্রিক। রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষায় বললে কথাটি এমনি দাঁড়ায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের তাৎপর্য হল — জাতীয় মানসের জাতীয়তাবাদ থেকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি-সত্যে উত্তরণের স্বীকৃতি। এ সম্ভব হয়েছিল একদিকে বিশ্ব-মানবের ঐক্য ও কল্যাণবোধের আকাংখা থেকে এবং ব্যক্তি-মানসের স্বাতন্ত্র্যে শ্রদ্ধাবোধ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে জীবনাচরণ-পদ্ধতি এবং ধর্মকে বড় করে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে মানুষকেই শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব-স্বীকৃত কবি। এই কবি প্রতিভার দিকেই বাঙালী সমালোচকগণের দৃষ্টি এ-যাবৎ প্রসারিত। তাঁর অন্যান্য সৃষ্টি সম্পর্কে উল্লেখ করতে যেয়ে জনৈক সমালোচক বলেন :

> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যকার, গীতকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, হাস্যরসিক, পত্র ভ্রমণ-কথোপকথনে কারুশিল্পী — এমন কি, গল্প লেখক, ঔপন্যাসিক।[৩]

এখানে স্মরণযোগ্য, কোন প্রতিভা বিশেষত শ্রেষ্ঠ প্রতিভা — বিচিত্রমুখী হয়ে থাকে কেবল মাত্র আত্মক্ষমতা ঘোষণার জন্য নয়, আত্মপ্রকাশের আন্তরিক যন্ত্রণায় তাঁরা নানা শিল্পরীতিকে গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং যে কোন শিল্পরীতি বিশ্লেষণ করতে হবে — সেই শিল্পরীতির বিশিষ্ট স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে। যেহেতু একজন শ্রেষ্ঠ কবি, কাজেই তিনি আর মহৎ ঔপন্যাসিক হতে পারবেন না, এ মতাদর্শ যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক ও পরিচ্ছন্ন নয়। বুদ্ধদেব বসু পূর্ব-বিশ্বাস নিয়ে রবীন্দ্র-কথা-সাহিত্য বিশ্লেষণ করতে যেয়ে আপাতবিরোধী বহু মন্তব্য করেছেন। তাঁর বিশ্বাস :

> কবিতায় আর কথা-সাহিত্যে সমান মর্যাদা কারো ভাগ্যেই জুটেছে বলে শোনা যায় না, ও দুয়ের পরস্পর সখ্যভাব নেই, আছে প্রতিযোগিতা, পরস্পরকে দমিত অথবা বিক্ষত করাই এদের স্বভাব।··· রবীন্দ্রনাথ কবি আর কথা-শিল্পীর সম্পূর্ণ সংগতি ঘটাতে পারেন নি — এতবড়ো কবির কাছে সেটা আশা করাও অন্যায় হয়।[৪]

বুদ্ধদেব বসু কি বলতে চেয়েছেন, আমাদের পূর্বোধৃত বক্তব্য থেকে আশা করি স্পষ্ট হয়েছে। অন্যত্র তিনি রবীন্দ্র প্রতিভার উদ্ভাবনী শক্তির অক্ষমতার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি বলেই — ঔপন্যাসিক-দৃষ্টিতে তিনি যুগাতিক্রমী প্রবর্তনা পেয়েছিলেন। তাছাড়া ঔপন্যাসিক প্রতিভা কোন ক্রমেই নাট্য, কবি, প্রাবন্ধিক প্রতিভাকে অস্বীকার করে না। বস্তুত, সবকিছু মিলিয়েই ঔপন্যাসিক-প্রতিভা গড়ে ওঠে। কপাল কুণ্ডলা এবং পথের পাচালীতে — একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাই বাধ্য হয়েছেন পরবর্তী অংশে মন্তব্য করতে :

> চতুরঙ্গের সৌষম্য উল্লেখযোগ্য, যোগাযোগ, অসমাপ্ত হলেও কবির সঙ্গে ঔপন্যাসিকের সার্থক মিলনের দৃষ্টান্ত।··· এই গোরা একটি বই পড়ে ধারণা হয় যে অন্তত একজন মহাকবিকে ঔপন্যাসিকেরও উপাদান দিয়েছিলেন তাঁর ভাগ্য বিধাতা।[৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি-দৃষ্টিই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নব-যুগ উদ্বোধনে ভিন্নতর প্রবর্তনা এনেছিল। কবিদের দৃষ্টি ব্যক্তিত্বের নানামুখী মানসিকতাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। হৃদয়ের বৈচিত্র্য, প্রবণতা, কল্পনা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে প্রকাশ করাই কবির দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিত্ব সুত্রে হৃদয়িক মূল্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই — মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের জন্মদাতা তিনি। চোখেরবালি — সেই অর্থে বাংলা

সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। এ-কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘটনাতে উৎসাহী নন, মানুষের ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণা, বৈচিত্র্য, কামনা-সংঘাত অর্থাৎ ঘটনার অভিঘাতে মানব মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্র অঙ্কনেই তিনি অধিক অনুপ্রেরণা পান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জগৎসত্য, বাস্তব-সত্য এবং হৃদয়-সত্যের পারস্পরিক সম্মিলন ঘটাতে পেরেছেন; এই উভয় সত্যের পারস্পরিক মিশ্রণেই ঔপন্যাসিক-দৃষ্টি গড়ে উঠে। সমন্বয়-ধর্মী মানসিকতা রবীন্দ্রমানসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাস রচনায় যেখানে দুর্বল হয়েছেন — সেখানে কবিত্ব এবং ঘটনার সমীকরণের অভাবই কেবলমাত্র বর্তমান নয়, অন্যান্য বহু কার্যকারণও উপস্থিত — আমরা যথাস্থানে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

পূর্বেই বলা হয়েছে কথা-সাহিত্যের উপাদানের মধ্যে পারিপার্শ্বিক একটি। উপন্যাসের স্থান-কাল-সমাজ ইত্যাদি পারিপার্শ্বিকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিকাশে এই পারিপার্শ্বিকের একটি ভূমিকা থাকে। ব্যক্তি এবং পারিপার্শ্বিকের পারস্পরিক সঙ্গতিপূর্ণ উপস্থাপন সম্পূর্ণতই নির্ভরশীল লেখকের মানসিক প্রবণতার উপর। রবীন্দ্রউপন্যাসে চরিত্রকে বিকশিত করবার অন্তরালে পরিবেশ, ঘটনার মতই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ সম্ভবপর হয়েছে রবীন্দ্র দৃষ্টির এবং উপলব্ধির সমগ্রতাবোধের উপর। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন অপরিসীম সৌন্দর্যবোধে এবং আন্তরিক আকর্ষণে। তাঁর কাছে প্রকৃতি জড় বা কেবল বস্তু হিসাবে উদ্ভাসিত হয়নি; উপস্থিত হয়েছে একটি গভীর ব্যক্তিত্ব নিয়ে। প্রকৃতি-বোধের চূড়ান্ত মানসিক সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়। এই প্রবণতার জন্যেই রবীন্দ্র-উপন্যাসে পরিবেশ হিসাবে প্রকৃতির ভিন্ন তাৎপর্য আছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিত্ব কেবল চলিষ্ণু নয়, প্রকৃতি-পরিবেশের ছোট ছোট সংঘাতে, প্রভাবে বর্ধিতও বটে। দেশকাল এবং প্রকৃতি-পরিবেশের সামগ্রিক পটভূমিতে বিন্যস্ত হয়েই রবীন্দ্র-উপন্যাসের চরিত্রগুলি ঘটনা সংঘটিত করেছে, চিন্তা করেছে, সিদ্ধান্ত দিয়েছে, পরিবর্তিত এবং বিকশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয়, সেক্সপীয়রের নাটকে প্রকৃতি-পরিবেশের স্থান সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন:

> It cannot be said that beauty of nature is ignored in his writings, only he fails to recognize in them the truth of the inter-penetration of human life with the cosmic life of the world.[৩]

পরিবেশ এবং প্রকৃতিকে বহু বিচিত্রভাবে প্রয়োগ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর উপন্যাসের ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতি এবং পরিবেশের পটভূমিতে উপন্যাসের ঘটনা সংস্থানই কেবল করেন নি— উপন্যাস-সৃষ্ট চরিত্রের ভাবাবেগের সংগেও প্রকৃতিকে নানা ভাবে সংগ্রথিত করেছেন ;— কোথাও প্রকৃতি-পরিবেশের প্রতীকে, ইঙ্গিতে, উপমায় চরিত্র-চিত্ত প্রতিবিম্বিত করেছেন ; কোথাও প্রকৃতির প্রভাবে চিত্ত-আবেগ সঞ্চার করে চরিত্রের উপর আলোকপাত করেছেন। 'The truth of the inter-penetration of human life with the cosmic life of the world' রবীন্দ্র-উপন্যাসের চরিত্র এবং পরিবেশ বিন্যাসের কৌশলের মধ্যে সংগ্রথিত হয়ে আছে। মানুষকে সামগ্রিক ভাবে উপলব্ধি করার মানসিকতা থেকেই এই পরিবেশ-প্রকৃতি-চেতনা শৈল্পিক ভাবে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। ভারতীয় ইতিহাস এবং সাহিত্যের ঐতিহ্যে পরিবেশ এবং ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক মানসিক সম্পর্কের অতি-বিস্তৃত সত্য এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণের সময় আমরা দেখিয়েছি — নিরাসক্ত-জীবন-দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। নিরাসক্তি এবং সমগ্রতাবোধ পরস্পর বিরোধী নয়, একে অপরের পরিপূরক। এই নিরাসক্ত দৃষ্টির জন্যেই রবীন্দ্র-উপন্যাসের কোন চরিত্রই স্রষ্টার জীবন উত্তাপহীন নির্জিব নয় ; বরং নিখিলেশের চেয়ে সন্দীপ জীবন্ত, অক্ষয়বাবু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, হারাণবাবুকে স্মরণে রাখতে বাধ্য হই। এর কারণ রবীন্দ্রমানসের উক্ত নিরাসক্তি এবং সমগ্রতাবোধের মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ মানুষকে বিচার করতেন তার সমগ্র-জীবনের এবং দেশকাল-সভ্যতার পটে ফেলে ব্যক্তি-হৃদয়কে শ্রদ্ধা করে। এই দৃষ্টিই যথার্থ ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি। রবীন্দ্রমানসের নিরাসক্তি এবং সমগ্রতাবোধের জন্যেই তিনি কোন মানুষের রূপকে কেবল দেখতেন না, স্বরূপকে বিচার করতেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল ভাব-সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন রূপ-সাধক। চণ্ডীদাস তাকে আকর্ষণ করত, কিন্তু বিদ্যাপতি তাঁকে আলোড়িত করত। তাঁর দৃষ্টির নিরাসক্তি, সমগ্রতাবোধ, সমন্বয়ধর্ম এবং সর্বোপরি ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের জন্যেই চরিত্র সম্পর্কে তিনি পরিচ্ছন্ন মন্তব্য করতে পেরেছিলেন :

> ইংরেজি ভাষায় ক্যারেক্টার শব্দের একটা অর্থ, স্বভাব, নৈতিক চরিত্র ; আর একটা অর্থ, চরিত্ররূপ। অর্থাৎ, এমন কতগুলি গুণের এমন সমাবেশ যাতে এই সমাবেশটি বিশেষভাবে লক্ষ্য গোচর হয়। পূর্বেই বলেছি, এই রকম বিশেষ গোচরতাই আর্টের ধর্ম। নাট্যে কাব্যে চিত্রে নৈতিক সদ্গুণের চেয়ে এই ক্যারেক্টারের মূল্য বেশি। ...

হেডমাষ্টার তাঁর স্কুলের সবচেয়ে শিষ্টশান্ত অধ্যয়নরত ভালো ছেলেটির প্রতি তর্জনী নির্দেশ করে তাকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করে রাখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, তর্জনীর জোরেও আমরা তাকে স্পষ্ট দেখতে পাইনে। যাকে খুবই দেখতে পাওয়া যায় সে হেড মাষ্টারের আদর্শ ছেলে নয় ··· সেটা ডানপিটে স্কুল পালানো ছেলে, আপন প্রাণপূর্ণ বিশেষত্ব দ্বারা সে খুবই স্বপ্রকাশ। ব্যবহারের দিক থেকে তাকে অবজ্ঞা করা চলে, কিন্তু প্রয়োজন নিরপেক্ষ প্রকাশের দিক থেকে সে ছেলে সেরা ছেলে। ···

আমরা হাজার প্রমাণ দেখাতে পারি যে, আর্টে আমরা গুণবানকে চাইনে, রূপবানকে চাই। ··· শ্রীমন্ত সদাগরের চেয়ে রূপবান ভাঁড়ুদত্ত। বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান। হীরা আমাদেরকে ঘুমোতে দেয় না, সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান বলে নয়, রূপবান বলে, সাধারণ অস্পষ্টতার মাঝখানে সে বিশেষ ব'লে সুপ্রত্যক্ষ ব'লে। ··· তাঁরা (সমালোচকেরা) যে বিশিষ্টতাকে আর্টের সম্পদ বলে জানেন সে বিশিষ্টতা প্রলোভন নিরপেক্ষ উৎকর্ষ।[৭]

রবীন্দ্রমানসের শিল্প-বোধের এই বিশেষ মানসিকতার জন্যেই — তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি খণ্ডিত নয়, উদ্দেশ্য প্রচারের যন্ত্রে রূপায়িত হয়নি। চরিত্র সৃষ্টির এই নিরাসক্ত দৃষ্টিই রবীন্দ্রপ্রতিভার গৌরব। আধুনিক উপন্যাসের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্র-মানসের উক্ত সত্যই যুগানুগ রূপান্তরের মধ্যদিয়ে আজও আত্মপ্রকাশ করছে।

উপন্যাসের মধ্যে কখনো গণ-জীবনের বৃহত্তর সত্যের ব্যঞ্জনা মূর্তিলাভ করে, কখনো ব্যক্তি-জীবনের মুক্তি-কামনা সমাজ জীবনের চার দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরে। এই উভয় সত্যই রবীন্দ্রউপন্যাসে বর্তমান। একদিকে চোখেরবালি অন্যদিকে গোরা। তবে লেখকের কাজ মনুষ্য-জীবন এবং দেশকাল বিধৃত মানুষকে নিয়ে। সেদিক দিয়ে চরিত্র-সৃজনই ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য। এই চরিত্র-সৃজনী-ক্ষম প্রতিভার এক প্রান্তে থাকে অন্তপ্রেরণার বহির্দেশের বস্তু, যাকে হেগেল বলেছেন বস্তু জগতের সামগ্রিকতা, অপর প্রান্তে থাকে মানবিক জগতের বিস্ময় অন্তর প্রদেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুইকেই মিলিয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্র সৃজন প্রয়াসকে কয়েকটি রীতিতে মোটামুটি ভাগ করা যায়।

১। চরিত্র-পাত্রগুলির পারস্পরিক সংঘাত, ঐক্য, সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে লেখকের সচেতনতা।

২। উপন্যাস-ধৃত চরিত্রের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টি দান। কখনো প্রকৃতিবিধৃত মানুষ, কখনো সমাজ বিধৃত মানুষ, কখনো আত্মগত, কখনো

ঘটনাগত ব্যক্তি-মানুষের নানা পটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যবহার করেছেন।

৩। প্রকৃতি ও পরিবেশকে চরিত্রের সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে উপলব্ধি করে তিনি প্রকাশ করেছেন।

৪। ঘটনা নয়, ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়াই রবীন্দ্রমানসকে আকৃষ্ট করে।

৫। সমাজ, সভ্যতা, পরিবার এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিকে স্থাপন করে, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রগুলিকে বিকশিত করেন।

৬। সমগ্র দ্বন্দ্বের এবং যন্ত্রণার পরিমণ্ডলে কার্যকর থাকে রবীন্দ্রমানসের নিরাসক্তি। প্রতিটি চরিত্রকে তিনি যথাযথ রূপদান করেন, এবং এই সামগ্রিক দ্বন্দ্ব লালিত হয় বৃহৎ ঐক্যবোধে — এর মধ্যথেকেই জীবন সংক্রান্ত এবং সমাজ সভ্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রমানসের ইচ্ছাটাও প্রতিফলিত হয়। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে, রবীন্দ্রউপন্যাসগুলি ঔপন্যাসিকের জীবনার্থের রূপান্বিত রূপক।

রবীন্দ্রমানসের উল্লিখিত সমগ্রতার দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা রবীন্দ্রউপন্যাসের শিল্পস্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াসী হবো।*

*লেখকের যন্ত্রস্থ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ মুদ্রিত হল। বইটি বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হবে।

॥ নির্দেশিকা ॥

১ উপন্যাস-বিচারের ভূমিকা

১। Priestly : *Literature and the Western Man*
পৃঃ ৮২-৮৩, উদ্ধৃত উপন্যাস ও প্রিস্ট্‌লে ; প্রবন্ধ পত্রিকা, মাঘ ১৩৬৮, পৃঃ ১৭।

২। Walter, Allen : *The English Novel* : Introduction,
Penguin Publication, fourth edn., 1963, P. 15.

৩। Forster, E. M. *Aspects of Novel.* 2nd edn., 1928, p. 41.

৪। উদ্ধৃত, উপন্যাস ও প্রিস্ট্‌লে, প্রবন্ধ পত্রিকা। মাঘ ১৩৬৮, পৃঃ ১৭।

৫। The English Novel : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪১, ১৭।

৬। Luboock, Perey : *The Craft of Fiction,*
3rd edn., 1922, p. 40.

৭। Edger, Pelham : *The Art of the Novel.* 1933, p. 8.

৮। সরোজ বন্দোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমরা অনেকাংশেই তার সঙ্গে একমত। বন্দোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর : প্র-স, ১৩৬৮। পৃঃ ৯—৫৬।

৯। Lubock, Percy : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৭৫।

১০। Edger, Pelham : পূর্বোক্ত। পৃঃ ৯।

১১। Lathrop, H. B. : *The Art of the Novelist.*
Ist edn., 1921, p. 66

২ রবীন্দ্রমানসের উপাদান ও স্বরূপ

১। প্রভাত মুখোপাধ্যায় : ভারতে জাতীয় আন্দোলন, ভূ—স, পৃঃ ৩৬৮।

২। দ্রষ্টব্য গুণময় মান্নার রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি।

৩। সূর্যাবর্ত : অনিল সিংহ সম্পাদিত, নতুন সাহিত্য ভবন, ১৯৬১, পৃঃ ৭৩।

৪। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : রবীন্দ্রচর্চার ভূমিকা, পৃ—স, ১৩৬৮, পৃঃ ৫—৬।

৫। রণজিৎ কুমার সেন : ভারত ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ, প্র—স, ১৩৬৮, পৃঃ ১৮০।

৬। রাশিয়ার চিঠি। রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৫৮, পৃঃ ২৭৮।

৭। প্রসঙ্গ কথা। রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৫৮, পৃঃ ৫০৭—৫০৮।

৮। অরবিন্দ পোদ্দার: রবীন্দ্রমানস, প্র—স ১৯৫৭, পৃঃ ১৭।

৯। নূতন ও পুরাতন: স্বদেশ, রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, প্র—স ১৩৪৯, পৃঃ ৪৭৬।

১০। চিঠিপত্র: রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্র—স ১৩৪৬, পৃঃ ৫১৩।

১১। অরবিন্দ পোদ্দার: পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩।

১২। সভাপতির অভিভাষণ: সমূহ, রচনাবলী: দশম খণ্ড, ১৩৫৭, পৃঃ ৫০৪—৫০৫।

১৩। অরবিন্দ পোদ্দার। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৫।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাশিয়া ভ্রমণের আগেই এই সমিতি বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প-উপন্যাস অনুবাদ করিয়েছিল।

১৫। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ: বিশ্ব ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ, দ্বি—স, ১৩৬২, পৃঃ ২৩৭—২৩৮, থেকে উদ্ধৃত।

১৬। Woodworth and Mariquis : *Psychology*, Tweenteeth edn., 1949, p. 152.7.

১৭। প্রভাত মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, সংশোধিত সংস্করণ, ১৩৬৭, পৃঃ ৩—৪।

১৮। নীলমণির চার পুত্র: রামলোচন ১৭৫৪, রামমণি ১৭৫৯, রামবল্লভ ১৭৬৭, কমলমণি ১৭৭০। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন রামমণির পুত্র।

১৯। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

২০। ডঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য: প্রভাত রবি, দ্বি—স, ১৩৬৮, পৃঃ ৬—৭।

২১। প্রভাত মুখোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

২২। শিবনাথ শাস্ত্রী: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, নিউ এজ, প্র—স, পৃঃ ৬৮।

২৩। বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি: প্র—স, ১৩৫৫, পৃঃ ৮৭।

২৪। প্রভাত মুখোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬।

২৫। মাতা দিগম্বরী স্বামীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে জীবন নির্বাহের ব্রত ধারণ করে মৃত্যুর দ্বারা তা উৎযাপন করে ছিলেন।

২৬। উপনিবেশবাদ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, বিদেশি ভাষার সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো, পৃঃ ৪২।

২৭। ছেলেবেলা: রচনাবলী ২৬ খণ্ড, ১৩৫৫, পৃঃ ৫৮৯—৯০।

২৮। পিতৃস্মৃতি: সৌদামিনী দেবী। প্রবাসী: ফাল্গুন, ৫ম সংখ্যা, ১৩১৮, পৃঃ ৪৭২—৭৪।

২৯। প্রভাত মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।

৩০। পিতৃস্মৃতি : সৌদামিনী দেবী। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭২।

৩১। জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুন-মুদ্রণ চৈত্র, ১৩৪৪, পৃঃ ১২১।

৩২। পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি,
প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৮, ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ৩৮৭।

৩৩। পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি,
প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৮, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৩৮৮।

৩৪। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,
চ-স, ১৩৬৯, পৃঃ ২৮৩।

৩৫। সুকুমার সেন : পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্র বিকাশ,
ক. বি, ১৯৬২, পৃঃ ৭।

৩৬। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র, ২৫শে এপ্রিল, ১৮৭৩।
উদ্ধৃত, ডঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, প্রভাত রবি, পৃঃ ২৩।

৩৭। প্রতিভাষণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবাসী, ১৩৩৮, মাঘ, পৃঃ ৫৫১।

৩৮। সুকুমার সেন : রবীন্দ্রবিকাশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

৩৯। বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, প্রভাত রবি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮।

৪০। ভোরে ··· কানাপালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত।
জীবনস্মৃতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯।

৪১। শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত কমল ঘোষাল। জীবনস্মৃতি, পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৮—৩৯।

৪২। জীবনস্মৃতি, পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৮।

৪৩। জীবনস্মৃতি, পৃঃ ৪০। শিক্ষক ছিলেন মেডিকেল কলেজের জনৈক ছাত্র।
দ্রঃ ছেলেবেলা। কিন্তু জীবনস্মৃতিতে আছে মেডিকেল স্কুলের ছাত্র।

৪৪। জীবনস্মৃতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮—৩৯।

৪৫। জীবনস্মৃতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০। শিক্ষক ছিলেন হেরেম্ব তত্ত্বরত্ন।

৪৬। ৪৭। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং ও জিম্নাষ্টিকের মাষ্টার আমাদিগকে
লইয়া পড়িতেন। জীবনস্মৃতি, পৃঃ ৩৯।

৪৮। জীবনস্মৃতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯। শিক্ষক অঘোরবাবু।

৪৯। রবিবারে সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত ··· সীতানাথ দত্ত যন্ত্র-তন্ত্র
যোগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। জীবনস্মৃতি, পৃঃ ৩৯। জ্যোতিরিন্দ্র
নাথ ঠাকুর জীবনস্মৃতিতে সীতানাথ ঘোষ উল্লেখ করেছেন।

৫০। জীবনস্মৃতি। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯।

৫১। সাধনা, বৈশাখ ১৩০২, পৃঃ ৫৪০।

৫২। জীবনস্মৃতির খসড়া ঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা,
২য় বর্ষ ১৩৫০, কার্তিক পৌষ, পৃঃ ১২১।

৫৩। ভারতী, ১২৮৫, শ্রাবণ, পৃঃ ১৭১—১৮৪।

৫৪। ভারতী ১২৮৪, ফাল্গুন, পৃঃ ৫০৩—৫১২।

৫৫। ভারতী, ১২৮৫, ভাদ্র, পৃঃ ২০১—২১২।

৫৬। ভারতী ১২৮৫, আশ্বিন, পৃঃ ২৭২—২৭৯।

৫৭। ভারতী, ১২৮৫ কার্তিক পৃঃ ২৮৯—২৯৮।

৫৮। প্রভাত মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২।

৫৯। জীবনস্মৃতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩—৫৮।

৬০। ডঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য। প্রভাতরবি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪।

৬১। লোকেন পালিত ঃ জীবনস্মৃতি, পূর্বোক্ত, ১৮৩—১৮৬।

৬২। পুলিন বিহারী সেন ঃ জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ,, বিশ্বভারতী পত্রিকা,
পঞ্চদশ বর্ষ, কার্তিক-পৌষ, ১৮৮০ শক, পৃঃ ১৩৪।

৬৩। সুধীন্দ্রচন্দ্র কর ঃ রবীন্দ্র আলোকে রবীন্দ্র পরিচয়, প্র—স ১৩৬৭, পৃঃ ১২৯।

৬৪। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা ঃ নরহরি কবিরাজ, তৃ—স, ১৯৬১, পৃঃ ১৮৯ এবং
কাজী আবদুল ওদুদ ঃ বাংলার জাগরণ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৭।

৬৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস,
প্র—স, ১৯২৫, পৃঃ ৩৫—৩৬।

৬৬। জীবনস্মৃতি : স্বাদেশিকতা ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৮।

৬৭। উল্লেখযোগ্য যে নবম অধিবেশনেও বালক কবি হিন্দুমেলার উপহার নামক একটি কবিতা নিয়ে উপস্থিত হন। The Ninth Aniversary of the Hindu mela was opened at 9. P. M. on Thursday, the 11th instant, at the Well Known Parseebagan. Indian daily 1875, 15 Feb. উদ্ধৃত, রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৪।

৬৮। বিলাত ঃ জীবনস্মৃতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৫—৬৬।

৬৯। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র। রচনাবলী, ১ম খণ্ড। দ্বি-স ১৩৪৬। পৃঃ ৫৪৬-৫৫৮।

৭০। য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি, রচনাবলী, ১ম খণ্ড, দ্বি-স ১৩৪৬,
পৃঃ ৬০৪—৬০৬, ৬০৭—৮।

৭১। এঁর Poetry পত্রিকায় গীতাঞ্জলীর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

৭২। শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী : বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ, দ্বি-স, ১৩৬৮, পৃঃ ৮২—৮৩।

৭৩। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, প-স ১৩৭০, পৃঃ ৩।

৭৪। প্রভাতমুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী তৃ-খ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৪ থেকে উদ্ধৃত।

৭৫। ভবানী সেন : একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী : রবীন্দ্রবীক্ষা, নীলরতন সেন সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ২২৬।

৩. রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : দেশ-কাল

১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত : শিল্পলিপি। দ্বি-মু ১৩৬৮, পৃঃ ১৫০—১৫১।

২। গোপাল হালদার : বাংলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি। দ্বি-স, ১৩৬৯। পৃঃ ৫—১৫।

৩। ভারতী : আশ্বিন ১২৮৪ থেকে ভাদ্র ১২৮৫।

৪। প্রকাশ ১৩৪১। সিংহলের রচিত, জুন ১৯৩৪।

৫। সুবোধ সেন গুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ। চ-স, সালের উল্লেখ নেই, পৃঃ ২৮৮—২৮৯। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃ-খ। তৃ-স, ১৩৬৮। পৃঃ ৩৪২।

৬। সুকুমার সেন : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪২।

৭। ভারতী ১২৮৮ অগ্রহায়ণ থেকে ১২৮৯ আশ্বিন।

৮। বালক ১২৯২ আষাঢ় থেকে মাঘ, ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ প্রকাশিত।

৯। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪০। নীহার রঞ্জন রায় : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা। প্র-স, ১৯৪১, পৃঃ ৩৯৫—৯৬।

১০। জীবন স্মৃতি। বিশ্ব ভারতী সং, ১৩৩৫, পৃঃ ২২০, ২৬১।

১১। নীহার রঞ্জন রায়। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০১।

১২। Legouis : *A History of English Literature* – 1937, P.254,

১৩। Act III, Sc. I.

১৪। কার্লমার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস : উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো, পৃঃ ৩৯—৪০।

১৫। আনিসুজ্জামান ঃ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য। প্রথম প্রকাশ, পৃঃ ৬২।

১৬। ভারতে বৃটিশ শাসন। উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২ — ৪৩।

১৭। R. H. Gretton : *The English Middle Class*, 1917. Preface দ্রষ্টব্য।

১৮। বিনয় ঘোষ ঃ বাংলার নবজাগৃতি, পূর্বোক্ত পৃঃ ৮১।

১৯। করুণা। রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ জন্ম শত বার্ষিক সংস্করণ, ১৩৬৮, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৭০৩।

২০। করুণা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫১ — ৫২।

২১। করুণা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০৮।

২২। করুণা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১০।

২৩। করুণা পূর্বোক্ত পৃঃ ৭৪৪।

২৪। করুণা, পূর্বোক্ত পৃঃ ৭১১।

২৫। করুণা. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১৪।

২৬। রমেশচন্দ্র দত্তের সমাজ উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

২৭। প্রমথ চৌধুরির 'একটি সাদা গল্প' দ্রষ্টব্য।

২৮। সুকুমার সেন। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৬।

২৯। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ ভারতে জাতীয় আন্দোলন। তৃ-স, ১৯৬৫, পৃঃ ১৪।

৩০। সুকুমার সেন। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৬।

৩১। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট, রবীন্দ্র রচনাবলী। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

৩২। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট। রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৭।

৩৩। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫।

৩৪। সূচনা ঃ রাজর্ষি। রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৪।

৩৫। রাজর্ষি ঃ বিশ্বভারতী ১৯৬৫, পৃঃ ১২।

৩৬। রাজর্ষি ঃ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ও সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

৩৭। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ১৩০৮—০৯ প্রকাশিত।

৩৮। নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে ১৩১০—১২ প্রকাশিত।

৩৯। গোপাল হালদার ঃ বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা। দ্বিতীয় খণ্ড। প্র-স ঃ ১৩৬৫, পৃঃ ৩৩।

৪০। নববঙ্গদর্শন ঃ সুরেশ সমাজপতি, সাহিত্য ঃ ১২ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩০৮, পৃঃ ৭০২-০৩।

৪১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃ-খণ্ড, পৃঃ ৩৫১।

৪২। চোখেরবালি। রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪১।

৪৩। উপন্যাসের নূতন ধারা ঃ রবীন্দ্র জীবনী, দ্বি-খণ্ড; প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পরিবর্ধিত সং, ১৩৫৫।

৪৪। উপন্যাসের নূতনধারা ঃ রবীন্দ্র জীবনী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়। পরি-স, ১৩৫৫, পৃঃ ৬৫ দ্বি· খণ্ড।

৪৫। গোপাল হালদার ঃ বাংলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি, পৃঃ ২৭—২৮।

৪৬। নৌকাডুবি। রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪৬।

৪৭। প্রবাসী। ভাদ্র ১৩১৪ থেকে ফাল্গুন ১৩১৬ প্রকাশিত।

৪৮। সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২১ থেকে ফাল্গুন ১৩২১।

৪৯। সবুজপত্র ১৩২২।

৫০। তিনপুরুষ নামে বিচিত্রায় প্রকাশিত। আশ্বিন ১৩৩৪ থেকে চৈত্র ১৩৩৫। ইতিমধ্যে জলধর সেনের তিন পুরুষ নামে উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এ কারণেই নাম পরিবর্তিত হয়।

৫১। Mulk Raj Anand : *Homage to Tagore*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।

৫২। নরহরি কবিরাজ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৫।

৫৩। Desai, A. R. *Social Background of Indian Nationalism.* 2nd edn, 1954, পৃঃ ৩০০—৩০২।

৫৪। আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২—৮৩।

৫৫। বিনয়ঘোষ ঃ বাংলার নবজাগৃতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৮।

৫৬। রবীন্দ্র জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৬।

৫৭। কাজী আবদুল ওদুদ ঃ বাংলার জাগরণ, পূর্বোক্ত, ১৬৫।

৫৮। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।

৫৯। বাংলার জাগরণ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।

৬০। বাংলার জাগরণ, পৃঃ ১৬৫—৬৬।

৬১। তপোবন ঃ প্রবাসী। পৌষ ১৩১৬।

৬২। নীহাররঞ্জন রায়। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৮।

৬৩। গোরা, পুনঃ মুঃ ১৩৫৮, পৃঃ ২৪।

৬৪। গোরা ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১।

৬৫। গোরা ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১৩—১৪।

৬৬। সবুজ পত্র ১৩২১ অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন।

৬৭। চতুরঙ্গ : রবীন্দ্র জীবনী, দ্বি-স, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮৩।

৬৮। চতুরঙ্গ : বিচিত্রা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৮, পৃঃ ৪৭৫।

৬৯। চতুরঙ্গ, পৃঃ ৪৭৬।

৭০। দেশীয় বিচারকদের দিয়েই ইংরেজ আসামীদের বিচার আইনসিদ্ধ করার সমর্থনে এ আন্দোলন হয়।

৭১। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২—৩৩।

৭২। ভারতে জাতীয় আন্দোলন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৫।

৭৩। উমাকান্ত হাজরা : বঙ্গজাগরণ ও স্বদেশের নানা কথা, প্র-স, ১৬১৩, পৃঃ ১০৬।

৭৪। ভারতে জাতীয় আন্দোলন। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭—৯৮।

৭৫। আনিসুজ্জামান। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।

৭৬। ইংরেজ ও ভারতবাসী, সমস্যা, সদুপায় ইত্যাদি। রচনাবলী দশম খণ্ড।

৭৭। সভাপতির অভিভাষণ পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনীর সভাপতি হিসাবে পঠিত। দশম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৭৮। ঘরে-বাইরে। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫১, পৃঃ ৫৪।

৭৯। স্বদেশী যুগের প্রবাসীর পাতা খুললেই দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে।

৮০। ঘরে-বাইরে। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪।

৮১। ঘরে-বাইরের পটভূমিতে আলোচিত হয়েছে।

৮২। ঘরে-বাইরে। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪২।

৮৩। ঘরে-বাইরে, পৃঃ ২৬৯।

৮৪। রবীন্দ্র জীবনী। তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৭।

৮৫। বাংলার নবজাগৃতি। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৭।

৮৬। R.P. Dutt. : *India Today*, Indian edn, 1947, P. 97 - 100.

৮৭। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ, প্র-স, পৃঃ ৬৭—৬৮।

৮৮। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা। পৃঃ ২০—২১। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য রজনীপাম দত্তের *India To-day.*

৮৯। বাংলার নবজাগৃতি। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩।

৯০। যোগাযোগ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৩৫৩, পৃঃ ৮।

৯১। যোগাযোগ, পৃঃ ৯।

৯২। যোগাযোগ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০।

৯৩। যোগাযোগ। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

৯৪। যোগাযোগ। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।

৯৫। যোগাযোগ। পৃঃ ২৪—২৫।

৯৬। যোগাযোগ। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭।

৯৭। প্রবাসী, ভাদ্র-চৈত্র ১৩৩৫। উপন্যাসটি শেষ হয়েছিল বাঙ্গালোরে থাকতে। শান্তিনিকেতনে ১৯২৮ সালে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছিল। জন্মকালে নাম ছিল মিতা।

৯৮। বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩৩৯।

৯৯। বিচিত্রা, আশ্বিন-অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

১০০। গল্পটি লেখা হয় সিংহলে থাকতে।

১০১। সুকুমার সেন। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৩।

১০২। মালঞ্চ। বিশ্বভারতী ১৯৬১, পৃঃ ৯৩—৯৪।

৪. রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস : শিল্পরূপ

১। নীহার রঞ্জন রায়। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনা, চতুরঙ্গ, শ্রাবণ, ১৩৭১, পৃঃ ২০৩।

২। পথে ও পথের প্রান্তে : পত্রধারা। ১ম—৩য় খণ্ড, প্র-স ১৩৪৫ পৃঃ ১৭-২১-২২।

৩। বুদ্ধদেব বসু। রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য : দ্বি-স ১৯৫৯, পৃঃ ২।

৪। বুদ্ধদেব বসু। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩, ৯।

৫। বুদ্ধদেব বসু, পূর্বোক্ত পৃঃ ৯, ৭।

৬। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের *Creative Unity*, প্র-স, পৃঃ ৬০।

৭। পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি। রচনাবলী : পুন-মুদ্রণ ১৩৬৩, পৃঃ ৪৩২—৩৪।